**ইউনিট ৬**
**স্বল্পমেয়াদী ফলগাছের চাষ**

# ইউনিট ৬ স্বল্পমেয়াদী ফলগাছের চাষ

বাংলাদেশে অনেক রকমের ফলগাছ জন্মে। তবে যেসব ফলের ব্যাপক চাষ হয় বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয় সেগুলো হচ্ছে- আনারস, কলা, পেঁপে, আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, লেবু জাতীয় ফল ও নারিকেল। এগুলোর মধ্যে আনারস, কলা ও পেঁপে স্বল্পমেয়াদী ফল গাছ হিসেবে পরিচিত। কারণ খুব অল্প সময়েই অর্থাৎ এক বা দুই বছরের মধ্যেই এগুলো ফল দিয়ে থাকে এবং খুব দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘজীবী নয়। এদেশের মোট ফল উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি ফল স্বল্পমেয়াদী গাছ থেকে উৎপন্ন হয়।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আনারস, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলের চাষ, আনারসের বিভিন্ন ধরনের চারার শনাক্তকরণ ও মাঠে রোপণ পদ্ধতি অনুশীলন, স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন ধরনের ফলের জাত শনাক্তকরণ এবং স্বল্পমেয়াদী ফলের আয়-ব্যয়ের হিসেব পদ্ধতি অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্ ারিত আলোচনা করা হয়েছে।

## পাঠ ৬.১ আনারস



### এ পাঠ শেষে আপনি –

- আনারসের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।



### উৎপত্তিস্থল

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশে সম্ভবত এর উৎপত্তি (Centre of origin)। আবার উক্ত অঞ্চলের প্যারাগুয়ে দেশটিকেও কেহ কেহ এর উৎপত্তিস্থল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কলম্বাস ১৪৯৩ সালে ওয়েষ্ট ইন্ডিজ পৌঁছিলে তিনি ও তার নাবিকগণ সেখানকার আদিবাসীদের গ্রামে এ ফলের চাষ দেখতে পান।

### উৎপাদন

বর্তমানে মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ইন্ডিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, হাওয়াই (যুক্তরাষ্ট্র) ও কুইন্সল্যান্ডে (অষ্ট্রেলিয়া) এর ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে। পর্তুগীজরা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে প্রথম আনারস প্রবর্তন করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৪০০০ হেক্টর জমিতে এক লক্ষ তেশট্টি হাজার টন আনারস উৎপাদিত হয়।

### পুষ্টিমান ও ব্যবহার

#### পুষ্টিমান

আনারস ফল খাদ্যপ্রাণ এ ও বি সমৃদ্ধ এবং এতে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ সি রয়েছে। এফলে শতকরা ৮৫ ভাগ পানি, ১৩ ভাগ চিনি, ০.৬ ভাগ আমিষ, ০.৩ ভাগ আঁশ, ০.০২ ভাগ ক্যালসিয়াম, ০.০১ ভাগ ফসফরাস, ০.৯ ভাগ লৌহ এবং ০.৬ ভাগ ম্ল থাকে। তাছাড়া ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ৬০ আই, ইউ খাদ্যপ্রাণ এ, ১২০ মি. গ্রা. রিবোফ্লাভিন এবং ৬৩ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ সি রয়েছে।

### ব্যবহার

আনারস টক মিষ্টি এবং রসালো একটি সুস্বাদু ফল। সাধারণভাবে তাজা পাকা ফলই আমাদের দেশের লোক খেয়ে থাকে। যদিও আনারস এবং এর রস বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়া হচ্ছে এবং বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। আনারসের উচ্ছিষ্ট অংশ গরুর খাবার হিসেবে উৎকৃষ্ট। আনারসের পাতা থেকে শতকরা ২-৩ ভাগ ৩৮ থেকে ৯০ সে. মি. লম্বা খুব শক্ত সাদা রেশমী স তা পাওয়া যায়। ফিলিপাইন ও তাইওয়ানে এ স তা দিয়ে 'পাইনা' নামে অতি মূল্যবান কাপড় তৈরি করা হয়।

## উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

### উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

আনারস গাছ দ্বিবর্ষজীবী এবং একটি গাছ একরার মাত্র ফল দিয়ে থাকে।

আনারস উদ্ভিদ বিজ্ঞানে Bromelliaceae পরিবারের *Ananas comosus* (L.) Merr- গোত্রের অন্ ভূর্ক্ত। আনারস গাছ দ্বিবর্ষজীবী এবং একটি গাছ একবার মাত্র ফল দিয়ে থাকে। এটি দেড় থেকে পাঁচ মিটার পর্যন্ উচু হতে পারে। প্রতি গাছে ৪০-৬৫ টি পাতা হয়। পাতা তলোয়ার আকৃতি, এক মিটার বা আরও বেশি লম্বা, ৫ থেকে ৮ সে. মি. প্রশস্ত , কিনারা সমান বা কাঁটাযুক্ত এবং পাতার শেষ প্রান্ত স ঁচালো। পুষ্পমঞ্জরী প্রায় ১৫০-২০০ বোঁটাহীন লালচে ফুল দ্বারা ঠাসা থাকে। আনারস একটি যৌগিক ফল (Multiple fruit) যা সরোসিস (Sorosis) নামে পরিচিত। ফল সাধারণত ১.০ থেকে ২.৫ কেজি হয়ে থাকে।

আনারস একটি যৌগিক ফল যা সরোসিস নামে পরিচিত।

চিত্র ৬.১.১ঃ জায়েন্ট কিউজাতের আনারস

## জাতসমূহ

আনারসের জাতসম হকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে- (১) কুইন (২) কায়েন এবং (৩)

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দেশে আনারসের অগনিত জাত রয়েছে। এগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে (Group) ভাগ করা হয়েছে- (১) কুইন (Queen) , (২) কায়েন (Cayenne), এবং (৩) রেড স্প্যানিশ (Red Spanish)। বাংলাদেশে এ তিনটি শ্রেণির তিনটি জাত যথাক্রমে হানি কুইন (Honey Queen), জায়ান্ট কিউ Giant কব ও ঘোড়াশাল (Ghorasal) নামে চাষ হয়ে থাকে। এ তিনটি জাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

**হানিকুইন ঃ** হানিকুইন জাতটি কুইন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি আগাম জাত। এর ফল মে-জুন মাসে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আহরণ করার উপযোগী হয়। ফল সমানভাবে পাকে এবং সম্পূর্ণ পাকা ফল উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এর চোখগুলো সামান্য গভীরে বসানো। ফলের ওজন এক থেকে দু'কেজি হয়ে থাকে। ফলগুলো অত্যন্ত সুবাসযুক্ত, রসালো এবং খুবই মিষ্ট। গাছ প্রতি ২ থেকে ৪টি সাকার এবং ৪ থেকে ৮টি পিপ হয়ে থাকে। এজাতটি পাতার কিনারা কাঁটাযুক্ত সর€ তরোয়ালের মত এবং সবুজাভ-তামাটে রংয়ের।

**জায়ান্ট কিউ ঃ** এ জাতটি কায়েন গ্রুপে এর অন্তর্ভুক্ত এবং নাবী জাত। এ গাছগুলো অনেক বড় হয়ে থাকে। পাতার কিনারা মসৃণ, কোনো কাঁটা নাই। পাতার ওপরভাগ সবুজ এবং নিচের অংশ ধূসর বর্ণের। ফল সবুজ তবে পাকা অবস্থায় হলুদ দেখায়। এর ফল জুন-জুলাই মাসে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আহরণের উপযোগী হয়। ফলের ওজন ১.৫ থেকে ৩.০ কেজি হয়। ফলের চোখগুলো ভাসা ভাসা সুতরাং ছিলতে খুব সুবিধা। ফলে আঁশ নাই বললেই চলে, মিষ্টি এবং রসালো। এ জাতে চারা খুব কম হয়। গাছপ্রতি একটি-দু'টি সাকার এবং দু' থেকে পাঁচটি পিপ হয়ে থাকে।

**ঘোড়াশাল ঃ** এ জাতটি রেড স্প্যানিশ গ্রুপ এর অন্তর্ভুক্ত এবং মধ্যম মৌসুমী জাত। এটি প্রথম দিকে শুধু ঘোড়াশাল এলাকায় হতো বলে ঘোড়াশাল নামে পরিচিত। পরবর্তীতে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া অঞ্চলে এর চাষ শুরু হয় এবং উক্ত অঞ্চলে ৬০-৭০ বছরের পুরানো আনারস বাগান রয়েছে। এ জাতের গাছ মধ্যম আকৃতির, পাতা কাঁটাযুক্ত, ফল পাকলে ইট বর্ণের দেখায়। অন্য দু'টি জাতের তুলনায় চোখ গভীরে বসানো এবং টক। ফল জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আহরণের উপযোগী হয়। গাছে ২-৪ টি সাকার এবং ৩-৫ টি পিপ হয়ে থাকে।

## বংশ বিস্তার

অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারের জন্য গাছ থেকে পাঁচ রকমের চারা পাওয়া যায়।

সাধারনত অযৌন পদ্ধতিতে আনারস গাছের বংশবৃদ্ধির জন্য নিু বর্ণিত পাঁচ রকমের চারা পাওয়া যায়।

**(১) সাকার বা কান্ডের চারা (Stem sucker) ঃ** পত্রাক্ষ থেকে বের হয় বলে একে কান্ডচারা বলে। তবে এটি সাকার নামেই বহুল পরিচিত। বংশবৃদ্ধির জন্য এ চারা উত্তম।

**(২) সাকার বা গোড়ার চারা (Ground sucker)ঃ** এ প্রকারের চারা গাছের ভূমি সংলগ্ন অংশ থেকে বের হয়। সেখানেই এ চারার শিকড় গজায়। সাকার নামে বহুল পরিচিত এবং রোপণের জন্য উত্তম তবে বাগান থেকে এ চারা কেহ বিক্রয় করে না। এটি মুড়ি (Ratoon) শস্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**(৩) পিপ (Slip) ঃ** এ জাতীয় চারা ফলের বোঁটা থেকে বের হয়।

**(৪) ক্রাউন (Crown) ঃ** ফলের উপরে ছোট ছোট অনেক পাতার সমন্বয়ে ক্রাউন চারা গঠিত হয়।

**(৫) ষ্টাম্প (Stump) ঃ** যে গাছ ফল দিয়েছে তার কান্ড নালা (Furrow) করে তার মধ্যে ফেলে এটিকে মাটি চাপা দিয়ে রাখলে অনেক চারা পাওয়া যায়।

চিত্র ৬.১.২ঃ আনারসের বিভিন্ন চারা

## জলবায়ু ও মাটি

### জলবায়ু

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে থেকে ১৫০০ মি. উঁচতায় আনারস জন্মে থাকে। যেখানে ৫১ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয় এমন শুষ্ক অঞ্চল থেকে ৫৫৪ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয় তেমন অঞ্চলেও আনারসের চাষ হয়। বাংলাদেশের সর্বত্রই আনারসের চাষ হতে পারে। তবে আনারস গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেজন্যই সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। তাপমাত্রা ১৫$^{\circ}$ থেকে ৩০$^{\circ}$ সেলসিয়াস পর্যন্ত আনারস ভালো জন্মে থাকে।

### মাটি

দেখা গেছে জৈবসার সমৃদ্ধ খিলক্ষেতে আনারস ভালো জন্মে।

সব ধরনের মাটিতেই আনারসের চাষ হতে পারে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উচ্চভূমি হওয়া চাই যেখানে বন্যা বা বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না। দেখা গেছে জৈবসার সমৃদ্ধ মাটিতে আনারস ভালো জন্মে। মাটির pH ৪.৫ থেকে ৬.৫ হলে আনারস গাছ বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে ভালো।

## চাষাবাদ প্রণালি

### জমি তৈরি

পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি আনারস চাষের উপযোগী।

বন্যা ও বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না, পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি আনারস চাষের উপযোগী। সমতল ভূমিতে চাষ দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি করতে হয়। পাহাড়ের ঢালে চাষের প্রয়োজন হয় না। দু'সারিতে রোপণের এক মিটার বেডটি চারা রোপণের জন্য মোটামুটি আগাছামুক্ত করতে হয়। সমতল ভূমিতে সমতলে বা উঁচু বেড তৈরি করে চারা রোপণ করা হয়। তবে সমতল ভূমিতে বেড তৈরি করে

চারা রোপণ করাই উত্তম। পাহাড়ের ঢালে বেড উঁচু করার প্রয়োজন নাই। তবে চারা রোপণের বেড কনটুর (Contour) বরাবর করতে হবে।

**চারা রোপণ**

এক সারি পদ্ধতিতে ৫০ সে. মি. দ রে দ রে সারিতে ৪০-৫০ সে. মি. দূরত্বে চারা রোপণ করা হয়।

চারা এক সারি পদ্ধতিতে (চিত্রঃ ৬.১.৩ দেখুন) বা দুই সারি পদ্ধতিতে (চিত্রঃ ৬.১.৪ দেখুন) রোপণ করা যেতে পারে। এক সারি পদ্ধতিতে ৫০ সে. মি. দ রে দ রে সারিতে ৪০-৫০ সে. মি. দ রত্বে চারা রোপণ করা হয়। দু'সারি পদ্ধতিতে এক মিটার প্রতি বেডে ৫০ বা ৬০ সে. মি. দূরত্বে সারিতে ৪০-৪৫ সে. মি. দ রত্বে চারা রোপণ করা হয়। দুই বেডের মাঝখানে পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা হিসেবে বা চলাচলের সুবিধার জন্য ৫০ সে. মি. জায়গা রাখা হয়। দু'সারি পদ্ধতিতে চারা রোপণ করা শ্রেয়। কারণ এতে দু'সারির পাশাপাশি গাছ পারস্পরিক ঠেকনার কাজ করে। এজন্য ফলসহ হেলে পড়ে না। হেক্টর প্রতি ৪৪,৪৪৪ টি চারার প্রয়োজন হয়।

চিত্র ৬.১.৩ঃ একসারি পদ্ধতিতে আনারসের চারা রোপণ

চিত্র ৬.১.৪ঃ দুইসারি পদ্ধতিতে আনারসের চারা রোপণ

রোপণের জন্য চারা সংগ্রহ এবং চারা তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কার্তিকের প্রথমভাগে মৌসুমী বৃষ্টির শেষে চারা সংগ্রহ করা হয়। গাছ থেকে চারা সংগ্রহের পর ৩-৪ সপ্তাহ ছায়ায় রেখে দেয়া ভালো। এরপর রোপণের পূর্বে ৩০ সে. মি. রেখে চারার বাকী মাথা কেটে ফেলা হয় যাতে রোপণের পর চারা

পাতার ভারে নুয়ে না পড়ে। এরপর গোড়ার ৫ সে. মি. পর্যন্ত শুকনো শিকড় ও পাতা ছেটে ফেলে ডাইথেন এম- ৪৫ (০.২%) সলিউশনে ডুবিয়ে নেয়া হয়। ডাইথেন সলিউশনে না চুবালে পাতা ও শিকড় ছাটায়ের পর ছাটায়ের জায়গা শুকাবার জন্য চারাগুলো আরও এক সপ্তাহ ছায়ায় রাখতে হবে।

চারা রোপণের জন্য ৫ থেকে ১০ সে. মি. গভীর করে গর্ত করতে হবে। এ সব গর্তে চারা রোপণ করে চারার গোড়ার চারদিকে শক্ত করে চেপে দিতে হয়। বছরের যে কোনো সময় চারা রোপণ করা যেতে পারে। যেহেতু বেশির ভাগ চারা আশ্বিন-কার্তিকে পাওয়া যায় সুতরাং চারাগুলো পৌষ-মাঘে রোপণ করতে হয় রোপণের পর সেচ দেয়াই উত্তম।

**সার প্রয়োগ**

গাছ প্রতি সারের পরিমাণ (গ্রাম/গাছ/বছর)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| পচাঁ আবর্জনা বা গোবর সার | - | ২০০ | এমপি | - | ১৫ |
| ইউরিয়া | - | ১৫ | জিপসাম | - | ১ |
| টি এস পি | - | ৫ | | | |

প্রতি বেডে বা লাইনে যতগাছ আছে তত গাছের জন্য মোট সার হিসাব করে, সেগুলো একসাথে মিশিয়ে বেডের মাটিতে ছিটিয়ে মিশে দিতে হবে। মোট জৈব সার, টিএসপি ও জিপসাম রোপণের

প র্বেই মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও এমপি সার রোপণের দু'মাস পর থেকে শুরু করে দু'মাস পর পর সমান পাঁচ কিস্তিতে গাছের গোড়ার চারদিকে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া উত্তম।

## পরিচর্যা

**সেচঃ** আনারস গাছের খুব অল্প পানির প্রয়োজন হয়। তাই সেচের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। তবে শুকনো মৌসুমে ২০-২৫ দিন পর পর সেচ দেয়া ফসলের জন্য ভালো। শুকনো মৌসুমে কচুরিপানা, খড়, আনারসের পাতা বা শুকনা ঘাস দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ঢেকে দিলে ঘাস কম হয় এবং মাটিতে রস সংরক্ষণ হয়। একারনে ফল বড় হয়।

**আগাছা দমনঃ** ভালো ফসল পেতে হলে আনারসের বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। আনারসের শিকড় মাটির গভীরে যায় না (Shallow rooted)। সুতরাং আগাছা সময়মত পরিষ্কার না করলে ফসল দুর্বল হয়ে পড়ে। মৌসুমী বৃষ্টির শুরুর সাথে সাথে জ্যৈষ্ঠে (মে-জুন) একবার, এবং বর্ষা শেষে কার্তিকে (অক্টোবর-নভেম্বর) আর একবার বাগানে আগাছা পরিস্কার, আনারসের মরা ও শুকনো পাতা বেছে

ফেলা এবং একই সাথে সার প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম ফসলের ফল আহরণের পর মুড়ি (Ratoon) ফসলের জন্য অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চারা ভাঙ্গা, আগাছা পরিষ্কার, আনারস গাছের শুকনো ও মরা পাতা বাছাই এবং সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।

রোপণের পর ১৪ থেকে ১৬ মাস বয়সের গাছে ফুল আসে। এবং মোটামুটি শতকরা ৬০ ভাগ গাছে ফল আসে।

**ফুল ও ফলের যত্নঃ** গাছে ৪০-৫০ টি পাতা হলে সাধারণভাবে রোপণের পর ১৪ থেকে ১৬ মাস বয়সের গাছে ফুল আসে। তবে পরিবেশ ও পরিচর্যা যতই ভালো হোক এ সময় মোটামুটি শতকরা ৬০ ভাগ গাছে ফল আসে। অবশিষ্ট শতকরা ৪০ ভাগ গাছের সবগুলোতে অথবা কিছু সংখ্যক গাছে শ্রাবণ (জুলাই-আগষ্ট) মাসে ফুল আসে এবং অমৌসুমে অগ্রহায়ন (নভেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে ফল আহরণ করা

যায়। তবে ১৫-১৬ মাস বয়সের আনারস গাছে ইথ্রেল (২- ক্লোরোইথাইল ফসফোনিক এসিড) ৫০০ পিপিএম এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড ১০,০০০ পিপিএম প্রয়োগে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ গাছে ফল আসে এবং এটি লাভজনক। শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ ফল সূর্যতাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে ফল যদি হেলে পড়ে তবে সূর্যতাপ এর কোষগুলো নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য ফল খাড়া রাখার জন্য প্রতিটির গোড়ায় কাঠি পুঁতে বেঁধে দিতে হয়। তাছাড়া আনারস গাছের পাতাগুলো ফলের চারদিক দিয়ে ওপর দিকে উঠিয়ে বেঁধে দেয়া অথবা শুকনো আগাছা দিয়ে ফল ঢেকে দিলে স র্যতাপে ফলের ক্ষতি হয় না।

**রোগ ও পোকামাকড় দমনঃ** সাধারণতঃ আনারস ফসলের তেমন পোকামাকড় রোগবালাই নাই। মিলিবাগ জায়ান্ট কিউ আনারসের মারাত্মক ক্ষতি করে এবং নিঃসৃত বিষাক্ত রসে শিকড়ের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে পচন ধরে এবং গাছ ঢলে পড়ে। অল্প স্বল্প হলে গাছ উঠিয়ে দ রে নিয়ে পুড়ে বা পুঁতে ফেলতে হবে। আক্রমণ ব্যাপক হলে ২ মি. লি. ডায়াজিনন ৬০ ইসি অথবা ৫ মি. লি ডুরসবান বা পাইরিফ্স ২০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে মিলিবাগ দমন হয়। তাছাড়া পঁচা রোগের কারণে (Heart rot) প্রথমে ভিতরের পাতায় পঁচন ধরে এবং পরবর্তীতে এ রোগ পার্শ্ববর্তী পাতাসম হে বিস্ ার লাভ করে। এক্ষেত্রে ০.২% রিডোমিল সলিউশন দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি সমানভাবে ভিজিয়ে দিলে এ রোগ দমন হয়।

### ফল আহরণ ও ফলন

ফল পরিপক্ক হলে সবুজ রং কমে যায় এবং পাকা শুরু করলে চোখের মধ্যবর্তী স্থানে সোনালী হলুদ রং ধারণ করে।

আনারস ফসল ভালো হলে হেক্টর প্রতি ৩০ থেকে ৫০ টন ফল প্রতি বছর আহরণ করা যেতে পারে। অন্ততঃপক্ষে ফলের বোঁটার দিক থেকে চার ভাগের এক ভাগ পাকলেই ফল আহরণ (Harvest) করা উচিত। ফল পরিপক্ক হলে সবুজ রং কমে যায় এবং পাকা শুর€ করলে চোখের মধ্যবর্তী স্থানে সোনালী হলুদ (Golden yellow) রং ধারণ করে। আনারস ফল আহরণের সময় ধারালো চাকু দিয়ে ৫ সে. মি. বোঁটা রেখে কাটতে হয়।

### মুড়ি ফসল (Ratoon crop)

যথাযথ পরিচর্যা করলে পর পর দু'টি মুড়ি ফসল নেয়া যায়।

২০-২২ মাস পর প্রথম ফসল আহরণের পর প্রতি গাছে মাত্র একটি সাকার রেখে বাকী অন্যান্য চারা ফেলে দিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই দু'টি চারার বেশি রাখা ঠিক না। এরপর আনারস বাগানটি আগাছামুক্ত করতে হবে এবং আনারসে পঁচা ও শুকনো পাতা বেছে ফেলতে হবে। তারপর প্রথম ফসল রোপণের আগে যে সব সার দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ জৈবসার, টিএসপি এবং জিপসাম একই পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে একই নিয়মে ইউরিয়া ও এমপি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। যথাযথ পরিচর্যা করলে পর পর দু'টি মুড়ি ফসল নেয়া যায় যা অধিকতর লাভজনক। তবে কাপাসিয়া অঞ্চলে ঘোড়াশাল জাতের ৬০-৭০ বছরের বাগান রয়েছে। এসব বাগানে গাছের বৃদ্ধি অত্যন্ত চমৎকার এবং ফলনও ভালো।

***অনুশীলন (Activity)*** *ঃ আনারসের বংশবৃদ্ধির জন্য কত রকমের চারা পাওয়া যায় এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন ।*

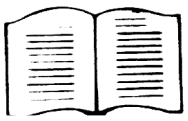

**সারমর্ম ঃ** আনারস টক-মিষ্টি রসালো যৌগিক ফল যা সরোসিস নামে পরিচিত। এর উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল বা প্যারাগুয়ে অঞ্চলে। বাংলাদেশের সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এর ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে । আনারসের তিনটি জাত হানিকুইন, জায়ান্ট কিউ ও ঘোড়াশাল বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। গাছ দ্বিবর্ষজীবী এবং একটি গাছ একবার মাত্র একটি ফল দিয়ে থাকে। পাঁচ রকমের সাকার দিয়ে অঙ্গজ পদ্ধতিতে এর বংশ বিস্ ার করা হয়। যেহেতু বেশির ভাগ চারা

আশ্বিন-কার্তিকে পাওয়া যায় সুতরাং চারাগুলো পৌষ-মাঘে রোপণ করতে হয়। আনারসের শিকড় মাটির গভীরে যায় না। সুতরাং বাগানে আগাছা পরিষ্কার জরুরী। রোপণের পর ১৪-১৬ মাস বয়সের গাছে ফুল আসে। কিন্তু শতকরা ৬০ ভাগ গাছে ফল আসে। তবে ইথরেল ৫০০ পিপিএম বা ক্যালসিয়াম কার্বাইড ১০,০০০ পিপিএম প্রয়োগে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ গাছে ফল আসে। হেক্টর প্রতি ৩০-৫০ টন ফলন হয়। যথাযথ পরিচর্যা করলে দু'টি মুড়ি ফসল পাওয়া যায়।

## পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৬.১

**১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।**

ক) আনারসের চাষ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ৩৪° অক্ষাংশের মধ্যে সীমিত।
খ) হানিকুইন জাতটি কায়েন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।
গ) আনারসের গাছ দ্বিবর্ষজীবী এবং একটি গাছ একবার মাত্র ফল দিয়ে থাকে।
ঘ) ফলের ওপর ছোট ছোট অনেক পাতার সমন্বয়ে ক্রাউন চারা গঠিত হয়।
ঙ) মৌসুমী বৃষ্টি শুরুর সাথে সাথে এবং বর্ষা শেষে আর একবার বাগানে আগাছা পরিষ্কার করা মোটেই প্রয়োজনীয় নয়।

**২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক) জৈবসার সমৃদ্ধ ..... আনারস ভালো জন্মে।
খ) আনারস একটি যৌগিক ফল যা ..... নামে পরিচিত।
গ) ফলের বোঁটা থেকে ..... চারা বের হয়।
ঘ) স্বীয় ..... কারণে অপরাগায়িত ফলের সৃষ্টি হয়।
ঙ) গাছে ..... টি পাতা হলে সাধারণভাবে রোপণের পর ১৪-১৬ মাস বয়সের গাছে ফুল আসে।

**৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

i) আনারসের জাতসম হকে কতটি শ্রেণিতে বাগ করা হয়েছে?
ক) ২ টি
খ) ৩ টি
গ) ৪ টি
ঘ) ৫ টি

ii) রেপণের পর কত মাসের বয়সের আনারস গাছে ফুল আসে?
ক) ১০ - ১২ মাস
খ) ১২ - ১৪ মাস
গ) ১৪ - ১৬ মাস
ঘ) ১৬ - ১৮ মাস

## পাঠ ৬.২ কলা

### এ পাঠ শেষে আপনি –

- কলার উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কলার উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কলার জলবায়ু ও মাটি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কলার চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

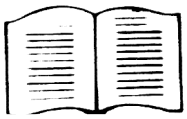

### উৎপত্তিস্থল

পৃথিবীতে প্রথম যে ক'টি ফসল আবাদ শুরু করা হয় কলা তার মধ্যে অন্যতম। মহামতি আলেকজান্ডার খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে সিন্ধু নদের উপত্যকায় কলার চাষ দেখতে পান। উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের ফসল হচ্ছে কলা। এশিয়ার উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ-প র্ব অঞ্চলেই কলার উৎপত্তিস্থল (Centre of origin) বলে অনেকে মনে করেন। অনেকের মতে আসাম-মিয়ানমার-ইন্দোচীন অঞ্চলেই কলার উৎপত্তিস্থল।

### উৎপাদন

বিষুবরেখার ৩০° উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশের উষ্ণ ও আর্দ্র দেশসমূহে কলা চাষ হয়।

বর্তমানে বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে ৩০° উত্তর এবং ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত সব উষ্ণ ও আর্দ্র দেশসম হে কলা চাষ হচ্ছে । সবচেয়ে বেশি যে দেশসম হে কলার চাষ হয় সেগুলো হচ্ছে - এশিয়া মহাদেশের ইন্ডিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, আফ্রিকা মাহাদেশের উগান্ডা, কঙ্গো, তানজেনিয়া, আইভারকোষ্ট, বুরুন্ডি, কেনিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার- কলম্বিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ও ভেনিজুয়েলা। অন্যান্য যে দেশসমূহে কলার আবাদ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে - বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, দক্ষিণ চায়না, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, ফিজি, ইসরাইল, মিশর, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, হাওয়াই, ফ্লোরিডা, কুইন্সল্যান্ড, ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডস ও ক্যানারি আইল্যান্ডস। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৯,০০০ হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় এবং ৬২৫,০০০ টন কলা উৎপাদিত হয়। ফলের মোট জমির ১৯.৩ ভাগ জমিতে কলার চাষ হচ্ছে এবং উৎপাদিত মোট ফলের শতকরা ৩৮.৮ ভাগই হচ্ছে কলা।

### পুষ্টিমান ও ব্যবহার

#### পুষ্টিমান

সব প্রয়োজনীয় পুষ্টি যেমন- খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ কলাতে রয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য (পাকা কলার) অংশে আনুমানিক পানি- ৭০ গ্রা. , আমিষ- ১.২ গ্রা., চর্বি- ০.৩ গ্রা., শর্করা-২৭ গ্রা., আঁশ- ০.৫ গ্রা. এবং পটাশিয়াম ৪০০ মি. গ্রা. রয়েছে। কলা খাদ্যপ্রাণ সি ও বি-৬ সমৃদ্ধ। তাছাড়া এতে সামান্য পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ-এ, থিয়ামিন, রিবোফ্লেবিন ও নিয়ানিন আছে।

#### ব্যবহার

উগান্ডা এবং তানজানিয়ার অনেক উপজাতির প্রধান খাদ্য কলা।

কলা সাধারণত পাকা ফল হিসেবেই খাওয়া হয়। তবে প্রক্রিয়াজাত করে কলা থেকে বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরি করা যায়। কলার অনেক জাত আছে যেগুলো সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। উগান্ডা এবং তানজানিয়ার অনেক উপজাতি কলা প্রধান খাদ্যরূপে (staple food) গ্রহণ করে থাকে। কলাগাছের কোনো অংশই ফেলনা নয়। পাতা ও কান্ড গর€র খাবার, এর থোর ও মোচা সবজি হিসেবে ব্যবহার হয়।

## উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

### উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

মাটির উপরে গাছটি চোঙ্গাকৃতির এবং ডেগা একটার পর একটা জড়িয়ে ধরে কৃত্রিম কান্ড তৈরি করে।

সাধারণতঃ কলাগাছে ৩০টি পাতা হয়।

কলাগাছ একটি বীরুৎ শ্রেণির (herb) , একবীজ পত্রী এবং ঔষধি উদ্ভিদ। এর মাটির নিচে কান্ড যথা কন্দ (corm) রয়েছে। কন্দ থেকে সাকার (Sucker) বা চারা বের হয়। মাটির ওপরে গাছটি চোঙ্গাকৃতির এবং ডেগা (sheath) একটার পর একটা জড়িয়ে ধরে পোশাকিকান্ড (pseudostem) তৈরি করে। এই কান্ডের মাঝে দিয়ে নতুন পত্রফলক শক্তভাবে পেঁচানো অবস্থায় উপরে বের হয়। সাধারণত কলাগাছে ৩০টি পাতা হয়। শীর্ষপাতা (Flag leaf) না আসা পর্যন্ত পাতার আকার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। একটি সুস্থ গাছে ১০-১৫ টি তাজা পাতা থাকে। কান্ডের মাঝদিয়ে উপরে বের হয়ে ঝুলে পড়ো পুষ্পমঞ্জরী স্পেডিস্ক (spadix) ধরনের এবং নৌকার মত ডেগা (sheath) দ্বারা আবৃত থাকে। পুষ্পমঞ্জরীর গোড়ার দিকে স্ত্রী ও উভয়লিঙ্গী এবং ডগার দিকে পুরুষ ও অপুষ্ট ফুল থাকে।

কলা উদ্ভিদ বিজ্ঞানে Musaceae পরিবারের এবহঁং (MY) *Musa* এর অন্ত র্ভুক্ত। সাধারণভাবে বীজহীন পাকা অবস্থায় ভক্ষণযোগ্য জাতগুলো *M. sapientum*, বামন জাতগুলো *M. cavendiংযরর* এবং আনাজী কলার জাতগুলো *M. Paradisiaca* প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

চিত্র ৬.২.১ঃ চাম্পা জাতের কলা

### জাতসমূহ

বাংলাদেশে অনেক কলার জাত রয়েছে। এগুলো তিনটি শ্রেণিতে বিভক্তঃ (১) পাকা অবস্থায় ভক্ষণযোগ্য বীজহীন জাতসম হ (২) বীচি কলা বা আইটা কলার জাতসম হ এবং (৩) আনাজী বা

সবজি হিসেবে ব্যবহৃত কলার জাতসমূহ। পাকা অবস্থায় ভক্ষণযোগ্য বীজহীন অনেক কলার জাত রয়েছে। তবে সব জাত বহুল প্রচলিত নয় বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ হয় না। এগুলোর বেশ কিছু জাত অনেক আগে বিদেশ থেকে প্রবর্তন করা হয় যেমন জাহাজী বা কাবুলী, বসরাই ও লাকাটান। বহুল প্রচলিত এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আবাদ হয় এমন ক'টি জাত হচ্ছে অমৃত সাগর, সবরি (রাজশাহীতে অনুপম এবং রংপুরে বর্তমান নামে পরিচিত), কবরী, (বাংলা কলা নামেও বহুল পরিচিত) ও চাম্পা। একমাত্র কবরীতে দু'একটি বীজ পাওয়া যায়।

**অমৃতসাগর বা সাগর কলা ঃ** এজাতটি বহুল পরিচিত। পঞ্চাশের দশকে এজাতটির আবাদ মুন্সিগঞ্জের রামপাল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে নংসিংদী অঞ্চলে এর চাষ প্রসার লাভ করে। বর্তমানে বগুড়া, নাটোর, যশোর এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ হয়ে থাকে। গাছ ২.০ থেকে ২.৫ মি. উঁচু হয়। পাতার বোঁটা ও মধ্যশিরা বেগুনি রংয়ের। ১০-১৫ টি সাকার দেয়। তবে গাছ খুব নরম। অল্প বাতাসেই ভেঙ্গে পড়ে। পাকা কলা খুব উজ্জল হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। খেতে খুবই সুস্বাদু। প্রতি কাঁদিতে ৫-৭ টি ছড়া হয় এবং প্রত্যেক ছড়ায় ১২-১৩ টি করে কলা থাকে। কাঁদির গড় ওজন ১২ কেজি।

**সবরি ঃ** সবরি একটি উৎকৃষ্ট জাতের কলা। উত্তর-পশ্চিমের জেলাগুলোতেই এর সর্বাধিক চাষ হয়ে থাকে। হলুদাভ সবুজ কান্ড, পাতার কোঁটা ও ডেগার (leaf sheath) কিনারা লাল। গাছ ২.৪ থোকে ৩.০ মি. লম্বা হয়ে থাকে। ৫ থেকে ৮ টি সাকার উৎপন্ন করে। কাঁদির ওজন ১০ কেজি। এক কাঁদিতে ৮৫ থেকে ১২০ টি কলা থাকে। পাকা কলার রং সোনালী হলুদ, সুবাসযুক্ত ও সুস্বাদু। কলার কিছু কিছু অংশে কখনও কখনও দলাদলা (Clod) থাকে।

**কবরী ঃ** সাধারনের কাছে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে কবরী একটি জনপ্রিয় কলা। এর গাছ সহজে ভাঙ্গে না এবং অল্প যত্নে হয়। গাছ ২.৬ মি. থেকে ৩.০ মি. উঁচু হয় এবং গাছ প্রতি ছয় থেকে আটটি সাকার উৎপন্ন হয়। প্রতি কাঁদিতে ৮০ থেকে ১৬০ টি কলা ধরে। পাকা কলার রং ধুসর বর্ণের হয়ে থাকে। এর শাঁস মিষ্টি তবে দু'একটি বীজ আছে। কাঁদির গড় ওজন ১৪ কেজি।

**চাম্পা ঃ** গাছ খুব শক্ত এবং চার মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও বরিশালে এর ব্যাপক চাষ হয়। এটি বাংলা কলা নামেও পরিচিত। প্রতি কাঁদিতে ১৫০ থেকে ২৫০ টি কলা হয়। কাঁদির গড় ওজন ১৬ কেজি। এজাতটি বানচিটপ (Bunchy top) ও পানামা রোগ (Panama wilt) এর প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। স্বাদে টক টক মনে হয়। তবে খুবই সুস্বাদু। পাকা কলার রং সোনালী হলুদ।

**মেহেরসাগর ঃ** এটি ঈধাবহফরংযরর প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম বাংলায় এটি জায়ান্ট গভর্ণর (Giant Governor) নামে পরিচিত। মেহেরপুর জেলায় প্রথম এর আবাদ শুরু হয়। তাই কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এর নাম দিয়েছে মেহেরসাগর। কাঁদির ওজন ১৫ কেজি। এটি বানচিটপ ও সিগাটেকা রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। পাকা কলার রং সবুজাভ হলুদ।

## বংশ বিস্তার ঃ

কলার বংশবৃদ্ধি সাধারণত মাটির নিচের কন্দ থেকে অযৌনভাবে উৎপন্ন চারা বা সাকার দ্বারা হয়ে থাকে।

কলার বংশবৃদ্ধি সাধারণত মাটির নিচের কন্দ থেকে অযৌনভাবে উৎপন্ন চারা বা সাকার দ্বারা হয়ে থাকে। মূল কন্দ (Mother Corm ) থেকে সোর্ড সাকার (Sword sucker) বের হয়। এ প্রকারের সাকারের গোড়া মোটা ও মজবুত হয় এবং পত্রফলক সরু বা গাছ আঘাতপ্রাপ্ত বা রোগাক্রান্ত হলে অথবা ফল আহরণের পর ওয়াটার সাকার (Water sucker) নামে আর এক প্রকারের সাকার বের হয়।

এর কান্ড নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সমান, পত্রফলক প্রশস্ত তবে পাশে ছড়ানো এবং কান্ড দুর্বল। কলাগাছের বংশবৃদ্ধির জন্য সোর্ড সাকার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

## জলবায়ু ও মাটি

**জলবায়ু ঃ** উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় কলা ভালো জন্মে। ১৫° থেকে ৩৫° সেঃ তাপমাত্রা এর বৃদ্ধির জন্য অনুকূল। প্রতিমাসে ২০ সে. মি. বৃষ্টি কলাগাছের বৃদ্ধির অনুকূল। মাসে ১০ সে. মি. এর নিচে বৃষ্টি হলে কলাগাছে সেচ দেয়া প্রয়োজন। নচেৎ গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। কলাগাছ ঝড়োবাতাস সহ্য করতে পারে না।

**মাটি ঃ** যদিও কলার ফসল আবাদের জন্য অনেক পানির প্রয়োজন হয় কিন্তু কলা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। কলার শিকড় যেহেতু মাটির ভিতর ৯০ সে. মি. পর্যন্ত প্রবেশ করে কিন্তু বেশির ভাগ শিকড় মাটির ৪৫ সে. মি. মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই জৈবসার সমৃদ্ধ এবং পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি যেখানে বন্যার পানি আসে না এবং বৃষ্টির পানি জমেনা কলা চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। ব্যবস্থাপনা ভালো হলে কলা চাষের জন্য মাটি কোনো সমস্যা নয়। তবে মাটির pH ৪.৫ থেকে ৭.৫ হওয়া চাই।

## চাষাবাদ প্রণালি

### জমি তৈরি

বন্যার পানি ঢোকেনা এবং বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না এমনি পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি কলা চাষের জন্য নির্বাচন করা উত্তম।

বারবার চাষ দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হয়। এরপর ২ × ২ মিটার দ রত্বে কাঠি পুঁতে সাকার রোপণের জায়গা চিহ্নিত করা হয়। কাঠিটিকে কেন্দ্র করে ৫০ সে. মি. ব্যাসার্ধের ৫০ সে. মি. গভীর করে গর্ত খুঁড়তে হয়। এসময় গর্তের উপরের মাটি (Top soil) আলাদা রাখতে হবে। ১০-১৫ দিন গর্তটি উন্মুক্ত ফেলে বাখাই ভালো। প্রথমে জৈবসার আলাদা বাখা উপরের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তে ফেলতে হবে। এরপর মাটি দিয়ে গর্তটি সম্পূর্ণ ভরে ফেলতে হবে।

### সার

সারের হিসাব গাছ প্রতি করাই ভালো। প্রতি বছর গাছ প্রতি জৈব বা গোবর সার ১২ কেজি, ইউরিয়া ১২০ গ্রাম, টিএসপি ২৫০ গ্রাম, এমপি ১২০ গ্রাম, জিপসাম ১১০ গ্রাম এবং জিংক সালফেট ২৫ গ্রাম দেয়ার সুপারিশ করা হয়। জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে গাছ প্রতি হিসাব করে অর্দ্ধেক গোবরসার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ২ ×২ মি. দ রত্বে সাকার রোপণ করলে ২৫০০ গাছের জন্য হেক্টরে ৩০ টন গোবরসার প্রয়োজন। এর অর্ধেক জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার এবং সম্পর্ণ টিএসপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট চারা রোপণের আগে গর্তের উপরের ২৫ সে. মি. মাটির মধ্যে মিশাতে হবে। চারা রোপণের দু'মাস পর থেকে শুর€ করে ইউরিয়া ও এমপি সার সমান ছয় কিস্ি তে দুমাস পরপর উপরি প্রয়োগ (Top dressing) করতে হয়। এগুলো কলা বাগানে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিমাতে হয়। মাটিতে 'যো' থাকলেই সার ছিটাতে ও মিশাতে হয়। নচেৎ সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে।

**চারা রোপণ ঃ** গর্তে সার প্রয়োগের পর চারা রোপন করতে হয়। সোর্ড সাকার রোপণ করাই উত্তম। রোপণের সময় চারার উচ্চতা কতটুকু তার চাইতে কন্দের ওজন কত বেশি সেটা গুরুত্বপূর্ণ। কন্দের ওজন যত বেশি হবে তত কম সময়ে গাছ ফল ও ফুল দেবে। ৩.০ থেকে ৫.০ কেজি ওজনের কন্দ রোপণ করাই শ্রেয়। মাতৃগাছ থেকে কন্দসহ সাকার আলাদা করার পর তা সরাসরি রোপণ করা যায়। কিন্তু দূরবর্তী স্থানে নিতে হলে কন্দের ৫ সে. মি. উপরে চারা কেটে ফেলে শুধু কন্দ নেয়াই ভালো। রোপণের পূর্বে কন্দের শিকড় ছাটাই করে ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) সলিউশনে ডুবিয়ে ছায়ায়

শুকিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হয়। এরপর কন্দগুলো গর্তের মাটির ২০-২৫ সে. মি. গভীরে রোপণ করতে হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর বা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি কন্দ বা সাকার বোপণের জন্য উত্তম সময়। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে, একেবারে বৃষ্টি নির্ভর হলে মৌসুমী বৃষ্টি শুরুর পর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (April-May) মাসে কলার সাকার বা কন্দ রোপণ করা ভালো। শুকনো মৌসুমে বিশেষ করে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে রোপণের পরপরই একটি সেচ খুব উপকারী।

**পরিচর্যা**

**সেচ ঃ** কলা গাছের জমি একেবারে শুকিয়ে যেতে দেয়া উচিত নয়। তাই শুকনো মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর সেচের প্রয়োজন হয়। গাছ বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় বিশেষ করে রোপণের প্রথম চারমাস কলা বাগান আগাছা মুক্ত রাখা খুব জরুরী। যেহেতু কলাগাছের শিকড় মাটির অল্প নিচেই থাকে তহি আগাছা বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করে। আবার কলা বাগানের পানি না জমে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়। প্রয়োজন হলে পানি নিষ্কাশনের নালা কেটে দিতে হবে।

**সারের উপরি প্রয়োগ** (Top dressing) ঃ যথাক্রমে আগাছা পরিষ্কারের পরপরই দিতে হবে এবং সার দেয়ার পর মাটিতে তেমন রস না থাকলে সেচ দিতে হয়। সার গাছের চারদিকে না ছিটিয়ে বরং দুই সারির মাঝখান দিয়ে ছিটিয়ে টিলার দিয়ে চাষ করাই ভালো। কদাল দিয়ে কুপিয়ে সার মিশানো যায় অথবা ডিবলিং (Dibling method) পদ্ধতিতে সার দেয়া যেতে পারে।

**আন্তঃফসল ঃ** সাকার রোপনের প্রথম ৪-৫ মাস বলতে গেলে জমি ফাঁকাই থাকে। যদি সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে চারা রোপণ করা হয় তবে কলা বাগানের মধ্যে আন্তঃফসল (Intercropping) অনায়াসে রবি মৌসুমের সবজি চাষ করা যেতে পারে। তবে এসব আন্তঃফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সার দিতে হবে। মাঘ মাসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) সাকার রোপণ করলেও আন্তঃফসল হিসেবে কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, শশা ইত্যাদি ফসল করে বাড়তি আয় করা যায়।

**মুড়ি ফসল ঃ** সাকার রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকে সাকার বের হওয়া শুরু করে। কলাগাছে থোর বের হওয়ার প র্ব পর্যন্ত ১৫ দিন পরপর মাটির ৫ সে. মি. উপরে ধারালো হাসুয়া দিয়ে সাকারগুলো কেটে বাগান থেকে দুরে কোথাও ফেলে দিতে হবে। থোর বা ফুল বের হবার পর পছন্দমত জায়গায় কোনো একটি সাকারকে বাড়তে দেয়া হয় যেটি মুড়ি ফসল (Ratoon crop) হিসেবে ফল দিবে। অন্য সব সাকার ফল আহরণের পূর্ব পর্যন্ত ১৫ দিন পরপর আগের মত কেটে ফেলা হয়। ফল আহরণের পর সব সাকার বাড়তে দেয়া যেতে পারে। এ সাকারগুলো যথাসময়ে অন্যত্র রোপণ করা যাবে না বিক্রি করা যাবে।

> থোর বা ফুল বের হবার পর কোনো একটি সাকারকে বাড়তে দেয়া হয় যেটি মুড়ি ফসল হিসেবে ফল দিবে।

**ফলের যত্ন ঃ** গাছে থোর আসার পরপরই গাছ যাতে বাতাসে ভেঙ্গে না যায়। সেজন্য বাশের খুঁটি দিয়ে বাতাসের বিপরীত দিক থেকে গাছে ঠেস দেয়া খুবই জরুরী। এ সময় গাছের মরা এবং শুকনো পাতা বাছাই করে দেয়া ভালো। থোর থেকে কলা বের হওয়ার আগেই গোটা থোর স্বচ্ছ বা সবুজ পলি ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দেয়া দরকার। এক্ষেত্রে পলিব্যাগের ওপর দিকে কাঁদির ডাঁটির সাথে বাঁধা থাকবে। নিচের দিকে ঢিলা করে বাঁধালেই চলবে। দু'চার দিন পরপরই নিচের বাঁধন খুলে পানি নিঙরে দেয়া এবং ফলের ডেগা ফেলে দিতে হয়। তাহলে Banana Leaf and Fruit Beetle কলার ক্ষতি করতে পারে না। পলিব্যাগ দিয়ে ঢাকার ফলে কোনো দাগ পড়ে না এবং কলা খুর আকর্ষণীয় হয়। Banana Leaf and Fruit Beetle Ges Banana Stem Weevil কলার দু'টি মারাত্তক ক্ষতিকর পোকা। বাগান সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকলে, মাটি কুপিয়ে দিলে এবং শুকনো মৌসুমে জমি ভরাট করে সেচ দিলে এগুলো ক্ষতির পর্যায়ে যেতে পারে না।

Banana Leaf and Fruit Beetle Ges Banana Steam Weevil দু'টি মারাত্তক ক্ষতিকর পোকা।

**পোকামাকড় দমন ঃ** Banana Leaf and Fruit Beetle এর পূর্ণ বয়স্ক পোকা গাছের কচিপাতা ও কচি ফলের উপরের টিস্যু (Tissue) খেয়ে ফেলে। ফল ডেগার মধ্যে আংশিক থাকা অবস্থায় এরা খাওয়া শুরু করে। ডেগা পড়ে গেলে এরা আর ফলের ক্ষতি করতে পারে না। সুতরাং কাঁদি বের হওয়ার সাথে সাথে পলিব্যাগ (সাধারণত ১৫ মি. লম্বা) দিয়ে এটি ঢেকে দিতে হবে। অধিকন্তু বাগানের মাটিতেই এ বাচ্চা (Grub) এবং পিউপা (Pupae) থাকে। সুতরাং শুস্ক মৌসুমে কলা বাগানে চাষ দিয়ে জমি ভরে সেচ দিলে এ বিটলের আক্রমণ কম হয়। Banana Steam Weevil এর বচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক পোকা উভয়েই গাছের কান্ডে অসংখ্য গর্ত করে ফেলে। ফলে গাছ ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। বাগানের পরিচর্যা যথাযথ হলে এর আক্রমণ হয় না। আক্রমণ বেশি হলে সে বাগান ভেঙ্গে ফেলাই ভালো। আবার অল্প আক্রমণ দেখার সাথে সাথে গাছ প্রতি ১০ গ্রাম কারবোফুরান (Carbofuran 5G) গাছের চারদিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে। এরপর সেচ দিতে হবে যাতে গাছ কারবোফুরান নিতে পারে। এর কার্যকারিতা একমাস স্থায়ী হয়।

কলার পানামা রোগ একটি মারাত্তক রোগ।

**রোগ দমন ঃ** কলার পানামা রোগ (Fusarium Wilt) একটি মারাত্তক রোগ। অমৃতসাগর ও সকরি এ দুটি উন্নত জাতেই এর অক্রমণ বেশি হয়ে থাকে (*Fusarium oxysporum* f.sp.cubense) নামক ছত্রাকের (Fungus) আক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এ ছত্রাক মাটিতেই থাকে। সুতরাং স্প্রে করে এ রোগ দমন করা অত্যন্ত কঠিন। এ রোগের আক্রমণে গাছের নিচের পাতাগুলো হলুদ হয়ে যায়। দু'একদিনের মধ্যে পাতার বোঁটা ভেঙ্গে পড়ে। খুব দ্রুত এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছ মরে যায়।

আক্রান্ত গাছ চিহ্নিত হওয়া মাত্র মাটিসহ উঠিয়ে দ রে ফেলতে হবে। গর্তের মাটি আবর্জনা জমিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। সম্ভব হলে ঐ জমিতে ৩-৪ বছর কলা চাষ না করাই ভালো। নতুন বাগান করতে চাইলে যে কলা বাগানে পানামা রোগ হয় নাই সে বাগান থেকে সুস্থ সবল সাকার সংগ্রহ করে রোপণ করতে হবে।

## আহরণ ও সংরক্ষণ

ফুল বের হওয়ার পর কলা আহরণের উপযুক্ত হতে ১০০ থেকে ১৩০ দিন সময় লাগে।

ফুল বের হওয়ার পর কলা আহরণের উপযুক্ত হতে ১০০ থেকে ১৩০ দিন সময় লাগে। কলা পরিপক্ক হলে এর শিরাগুলো সমান হয়ে যায় এবং ফ্যাকাশে সবুজ রং ধারণ করে। কলা পাকার অপেক্ষা না করে এসময় কাঁদি কেটে নামানো হয় এবং কলাগাছ কেটে দূরবর্তী স্থানে নিয়ে ফেলা হয়। এরপর ফানাগুলো এক এক করে পৃথক করে ঘরে খড়ের ওপর এক বা দু'সারি করে সাজিয়ে আবার খড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এতে কলা সমানভাবে পাকে এবং চমৎকার রং হয়। হেক্টর প্রতি সাধারণভাবে ২০-২৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

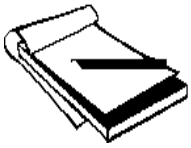

***অনুশীলন (Activity)ঃ*** *কলার জাতসম হকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, তা উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।*

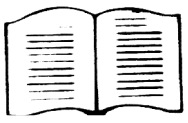

**সারমর্ম ঃ** কলা উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের ফল। কলা সাধারণত পাকা ফল হিসেবে খাওয়া হয়। কলার অনেক জাত আছে যেগুলো সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। আফ্রিকার অনেক উপজাতির প্রধান খাদ্য কলা। কলাচাষের অনুকূল তাপমাত্রা ১৫-৩৫° সেলসিয়াস। প্রতিমাসে ২০ সে. মি. বৃষ্টিপাত গাছের বৃদ্ধির জন্য উত্তম। কলাগাছ ঝড়োবাতাস সহ্য করতে পারে না। কলার সাধারণত অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। কলার জাতসমূহ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। সেচের ব্যবস্থা থাকলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর বা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সাকার রোপণের উত্তম সময়। মুড়িফসল কলাচাষের একটি বাড়তি সুবিধা। হেক্টর প্রতি সাধারণত ২০-২৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

## পাঠোত্তার মূল্যায়ন ৬.২

**১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।**

ক) একটি সুস্থ গাছে ১০-১৫ টি তাজা পাতা থাকে।

খ) কলাগাছ ঝড়ো বাতাস সহ্য করতে পারে।

গ) গুড়িকন্দ থেকে ফুল সৃষ্টির শুরু না হওয়া পর্যন্ত সাকার বের হয় না।

ঘ) সাধারণভাবে বীজহীন আবাদী কলার জাতগুলোর প্রায় সবই ট্রিপ-য়িড।

ঙ) রোপণের সময় চারার ওজনের চাইতে উচ্চতার গুরুত্ব অনেক বেশি।

**২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক) ..... এবং ..... অনেক উপজাতি কলা প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

খ) বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট ফলের শতকরা ..... ভাগই হচ্ছে কলা।

গ) কান্ডের মাঝ দিয়ে উপরে বের হয়ে ঝুলে পড়া পুষ্পমঞ্জরী .....ধরনের।

ঘ) ফল আহরণের পর ..... নামে এক প্রকার সাকার বের হয়।

ঙ) ফুল বের হওয়ার পর কলা আহরণের উপযুক্ত হতে ..... থেকে ..... দিন সময় লাগে।

**৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

i) অমৃতসাগর কলার প্রত্যেক ছড়ায় কয়টি কলা হয়?

ক) ৫-৭ টি

খ) ১০ -১২ টি

গ) ১২ - ১৩ টি

ঘ) ১৩ -১৫ টি

ii) চাম্পা কলার কাঁদির গড় ওজন কত?

ক) ১০ কেজি

খ) ১২ কেজি

গ) ১৪ কেজি

ঘ) ১৬ কেজি

iii) কোন্ কলা পানামা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন?

ক) অমৃতসাগর

খ) সবরি

গ) চাম্পা

গ) মেহের সাগর

## পাঠ ৬.৩ পেঁপে

### এ পাঠ শেষে আপনি –

- পেঁপের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পেঁপের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পেঁপের চাষের জন্য জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পেঁপের চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

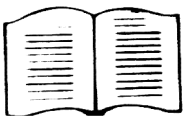

### উৎপত্তিস্থল

পেঁপে উষ্ণ মন্ডলীয় অঞ্চলের ফল। সম্ভবত উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দক্ষিণ মেক্সিকো এবং কোষ্টারিকায় এর উৎপত্তিস্থল। সেখান থেকে এফলটি পাশ্ববর্তী দেশসম হে দ্র€ত বিস্‌্তি লাভ করে উক্ত সময়ে পেঁপে ইন্ডিয়াতে আসে। অনুমান করা যায় জলবায়ু অনুকূল হওয়ার জন্য একই সময়ে পেঁপে বাংলাদেশে প্রবর্তন হয়।

### উৎপাদন

বর্তমানে সকল উষ্ণ মন্ডলীয় দেশসম হে যেমন- অষ্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই, ফ্লোরিডা, টেক্সাস, কালিফোর্নিয়ায়; বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, চীনদেশ, পুয়ের্টোরিকো, পেরু এবং মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশসম হে পেঁপের ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে পেঁপের ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও মাত্র ৪,০০০ হেক্টর জমিতে এর চাষ হয় এবং ২৭,০০০ টন পেঁপে উৎপন্ন হয়। দেশের সর্বত্র পারিবারিক বাগানে পেঁপে দু'একটি গাছ রয়েছে। কেবল রাজশাহী এবং যশোহর জেলাতেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পেঁপের ব্যাপক চাষ হয়।

### পুষ্টিমান ও ব্যবহার

#### পুষ্টিমান

পাকা পেঁপের শতকরা ৬০ ভাগ ভক্ষণযোগ্য। ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য পাকা পেঁপেতে আনুমানিক ৮৬.৬ গ্রা. পানি, ০.৫ গ্রা. আমিষ, ০.৩ গ্রা. চর্বি ১২.১ গ্রা. শর্করা, ০.৭ গ্রা. আঁশ, ২০৪ মি. গ্রা. পটাশিয়াম, ৩৪ মি. গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১১ মি. গ্রা. ফসফোরাস, ১ মি. গ্রা. লৌহ, ৩ মি. গ্রা. সোডিয়াম, ৪৫০ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ এ, ৭৪ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ সি, ০.০৩ মি. গ্রা. থিয়ামিন, ০.৫ মি. গ্রা. নিয়ামিন এবং ০.০৪ মি. গ্রা. রিবোফ্লাবিন আছে।

#### ব্যবহার

পাকা ফল হিসেবে এটি সর্বত্র আদৃত এবং বাংলাদেশ সহ অনেক দেশেই পেঁপে সবজি হিসেবে জনপ্রিয়।

পেঁপে অত্যন্ উপাদেয় ফল যা সারা বছরেই পাওয়া যায়। পাকা ফল হিসেবে এটি সর্বত্র আদৃত এবং বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই পেঁপে সবজি হিসেবে জনপ্রিয়। পেঁপের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী যেমন- জ্যাম, জেলী, মোরব্বা, হালুয়া, পায়েস, আইসক্রীম, শরবত ইত্যাদি সবার প্রিয় খাদ্য। তাছাড়া কাঁচা পেঁপে থেকে দুগ্ধবৎ যে কষ (Latex) পাওয়া যায় তা থেকে পেপাইন (Papain) উৎপন্ন হয়, যা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রসাধন সামগ্রী তৈরিতে এবং টেক্সটাইল ও চামড়া শিল্পে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। ঔষধ শিল্পেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। গোশত সিদ্ধ করতে সহায়তা করার জন্যও পেপাইন ব্যবহৃত হয়।

## উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

### উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

ফুল সাধারণত একলিঙ্গী ও ভিন্নবাসী অর্থাৎ পুর€ষ ও

পেঁপে গাছ Caricaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এর বৈজ্ঞানিক নাম *Carica papaya* L. পেঁপে চিরহরিৎ, দ্বিবীজপত্রী, বহুবর্ষজীবী বীরুৎ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ফসল। এর কান্ড শাখা বিহীন, ফাঁকা ও নরম। তবে বিশেষ অবস্থায় যেমন- গাছ ভেঙ্গে গেলে বা আঘাত প্রাপ্ত হলে এর কান্ড থেকে শাখা বের হয়। এটি দ্রুত বর্ধনশীল এবং দুই থেকে দশ মিটার উঁচু হতে পারে। গাছের কান্ড, পাতা, পাতার বোঁটা এবং ফল থেকে যে সাদা কষ বের হয় তাকে Latex বলে। কান্ড ফাঁকা এবং কান্ডে পাতার চিহ্ন স্পষ্ট। পাতা

কান্ডের চারদিকে একান্ রভাবে সজ্জিত। কান্ডের মাথায় অনেক পাতা এক সংগে জট বেঁধে থাকে। পত্রফলক ২৫ থেকে ৭৫ পাতার শিরাগুলো খুব স্পষ্ট। ফুল সাধারণত একলিঙ্গী ও ভিন্নবাসী (Dioecious) অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে থাকে। তবে উভলিঙ্গী (Hermaphrodite) ফুলও দেখা যায়। পত্রাক্ষে একক বা গু ফুল ধরে। স্ত্রীফুল ও উভলিঙ্গী সাধারণত বোঁটাহীন হয়। পুরুষফুল

লম্বা পুষ্পমঞ্জরী দন্ডে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। পেঁপে একক সরস বেরী জাতীয় ফল।

পেঁপে পরপরাগায়িত এবং বাংলাদেশে পেঁপে জাত সংরক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রিত পরাগায়নের সাহায্যে বীজ উৎপাদনের কোনো সংস্থা নাই। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট শাহী পেঁপে নামে একটি মাত্র পেঁপের জাত ১৯৯২ সালে মুক্তায়িত করেছে। এর গাছ মধ্যম আকৃতির। রোগবালাইয়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। যথাযথ পরিচর্যায় গাছ প্রতি ৪০ থেকে ৬০ টি ফল ধরে। ফলের গড় ওজন ৬৪০ গ্রাম। গাছ প্রতি ৩৮ কেজি ফল উৎপন্ন হয়। শাঁস কমলা রংয়ের, রসালো এবং সুমিষ্ট। এটি একটি একলিঙ্গী ভিন্নবাসী জাত।

চিত্র ৬.৩.১ ঃ ফলসহ পেঁপে গাছ

হাওয়াই এ প্রজননের মাধ্যমে যে জাতগুলো বের করেছে তন্মধ্যে সলো সানরাইজ ও সলো ওয়াইমিনাল বিখ্যাত। মালয়েশিয়া একটি মাত্র জাত উদ্ভাবন করেছে যেটি হচ্ছে 'ইকজোটিকা'। কুড়ি বছর গবেষণার ফসল হিসেবে ইন্ডিয়ার পুসা থেকে 'পুসা ডেলিসাস', পুসা ম্যাজেষ্টি, পুসা জায়ান্ট, পুসা ডোয়ার্ফ ও পুসা নানহা জাত বের করেছে। তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েমবাটোর থেকে CO-1, CO-2, CO-3 এবং CO-4 চারটি পেঁপে জাত বের করেছে এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হর্টিকালচার রিসার্চ থেকে 'কুর্গ হানি' নামে একটি পেঁপে জাত বের করেছে।

## বংশ বিস্তার

সারা বিশ্বে পেঁপের বংশবিস্তার বীজ দ্বারাই হয়। অঙ্গজ পদ্ধতিতে এর বংশ বৃদ্ধি বাণিজ্যিকভাবে কোথাও চালু হয়েছে বলে জানা নাই। তবে বিশেষ কোনো জাত সংরক্ষণ ও আবাদ করতে চাইলে

বিশেষ কোনো জাত সংরক্ষণ ও আবাদ করতে চাইলে নিয়ন্ত্রিত পরাগায়ণের মাধ্যমে বীজ উৎ - পাদন করা উচিত।

নিয়ন্ি ত পরাগায়ণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা উচিত। বীজের গায়ে যে পিচ্ছিল পদার্থ (Aril) থাকে তা অঙ্কুরোদগম রোধ করে। সুতরাং পাকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহের পর ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে পাটের বস্তার ওপর ঘষে পানিতে ধুলে পিচ্ছিল পদার্থ চলে যায়। এর পরপরই বীজ রোপণ করলে দু সপ্তাহের মধ্যে চারা বের হয়। অথবা বীজ পরিষ্কার করার পর ভালোভাবে শুকিয়ে নিছিদ্র আধারে (যাতে বাতাস ঢুকতে পারে না) সংরক্ষণ করলে অনেক বছর বীজ নষ্ট হয় না। তবে এমনিভাবে সংরক্ষণ করা বীজ গজাইতে দু' থেকে তিন এমনকি চার সপ্তাহ সময় নেয়। আজকাল বীজতলায় বীজ না ফেলে বীজ সরাসরি ছোট ছোট পলিব্যাগে রোপণ করা হয়। প্রতি পলিব্যাগে ৫/৬ টি বীজ ফেলা হয় এবং বীজ গজানোর পর তিনটি চারাকে বাড়তে দেয়া হয়। যেহেতু এদেশের সব পেঁপে জাতই একলিঙ্গী ভিন্নবাসী এবং চারা অবস্থায় কোনটা স্ত্রী গাছ বা কোনটা পুরুষ গাছ চেনা যায় না সুতরাং প্রতি গর্তে ১৫ সে. মি. দূরত্বে ত্রিভুজাকারে তিনটি চারা রোপণের পরামর্শ দেয়া হয়। তাহলে প্রতি গর্তে অন্তত একটি স্ত্রী গাছ পাওয়া যায়। কারণ অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ গাছ স্ত্রী গাছ হয়ে থাকে।

প্রতি গর্তে তিনটি চারা রোপন করলে অন্তত একটি স্ত্রী গাছ পাওয়া যায়।

প্রথা অনুযায়ী (Traditionaষ) ১০-১৫ সে. মি. উঁচু ১ থ ৩ মি. সাইজের বীজতলায় চারা উৎপাদন করা হয়। ১০-১৫ সে. মি. উঁচু জায়গার মিশ্রণ হবে এক-তৃতীয়াংশ জৈব সার, এক-তৃতীয়াংশ বালি এবং এক-তৃতীয়াংশ মাটি। এর সাথে অর্ধেক কেজি টিএসপি সার মিশালে ভালো। এরকম বীজতলায় ১০

সে. মি. দ রত্বের সারিতে ২.৫ সে. মি. দ রে দ রে বীজ ফেলতে হয়। বীজ ১.০ সে. মি. মাটির গভীরে দিয়ে ঝরণা দিয়ে সেচ দিলে মাটি চেপে যায়। প্রতিদিনই পানি দিতে হয়। চারা না গজানো

পর্যন্ত বীজতলা ১৫ সে. মি. উঁচু করে খড় দিয়ে ঢেকে দেয়া ভালো। ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে চারা বের হয়। বীজ বপনের পর ৫০-৬০ দিনের বয়সের চারা জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়। এক হেক্টর জমির জন্য চারা তৈরি করতে প্রায় ৫০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। মনে রাখতে হবে প্রতি গর্তে তিনটি করে চারা রোপণ করতে হয়।

## জলবায়ু ও মাটি

### জলবায়ু

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় পেঁপে ভালো জন্মে।

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় পেঁপে ভালো জন্মে, ২১° থেকে ৩০° সেঃ তাপমাত্রা পেঁপের বৃদ্ধির জন্য উত্তম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মি. উচ্চ ভূমিতেও এর আবাদ হতে পারে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় পেঁপে সর্বত্রই লাভজনক ভাবে চাষ করা যেতে পারে।

### মাটি

পেঁপে চিরহরিৎ শ্রেণির গাছ এবং সারা বছরেই ফুল ও ফল দিয়ে থাকে। তাই সঙ্গত কারণেই খুবই উর্বর জমির প্রয়োজন এবং মাটি পানি নিষ্কাশনের জন্য অনুকূল হওয়া চাই। পেঁপের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে পানি এবং মাটির ঢ়ঐ ৬.০ থেকে ৬.৫ হলেই পেঁপের সফল চাষ।

## চাষাবাদ প্রণালি

### জমি তৈরি

পেঁপে গাছ দু'এক ঘন্টার জন্যেও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

পেঁপের জন্য প্রচুর সূর্যের আলো প্রয়োজন। জমি চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হবে। এরপর ২ থ ২ মি. দ রত্বে কাঠি পুঁতে রোপণের জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। প্রতি গর্তে তিনটি করে চারা রোপণ করতে হলে প্রতি হেক্টরে ৭৫০০ টি চারার প্রয়োজন হবে। তারপর কাঠিটিকে কেন্দ্র করে ৫০ থ ৫০ সে. মি. সাইজে ৫০ সে. মি. গভীর করে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

### সার প্রয়োগ

পেঁপে আবাদের জন্য গাছ প্রতি ১০ কেজি জৈব সার, ৪৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৪৫০ গ্রাম এমপি, ২৪০ গ্রাম জিপসাম, ৬ গ্রাম জিংক অক্সাইড এবং বরিক এসিড ২৫ গ্রাম দেয়া প্রয়োজন। জমি তৈরির শেষ চাষের সময় গাছ প্রতি ৫ কেজি জৈব সার হিসাব করে সম্পর্ণ জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি গোবর সার অর্থাৎ ৫ কেজি গোবরসার, এবং সম্পূর্ণ টিএসপি, জিপসাম, জিংক অক্সাইড ও বরিক এসিড ভিত্তিসার হিসেবে (Basal dose) চারা রোপণের পূর্বে গর্তের উপরের ২৫ সে. মি. মাটির মধ্যে কোদাল দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া এবং এমপি চারা রোপণের দুমাস পর শুরু করে ৪৫ দিন পরপর প্রথম তিন কিস্ি গাছ প্রতি প্রত্যেকটির ৫০ গ্রাম করে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এরপর গাছে ফুল আসলে একই বিরতিতে ৫০ গ্রামের জায়গায় ইউরিয়া ও এমপি সার গাছপ্রতি ১০০ গ্রাম হিসেবে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

### চারা রোপণ

চারা রোপণের জন্য সেচের সুবিধা থাকলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (আশ্বিন) এবং জানুয়ারি-ফেব্র€য়ারি (মাঘ) মাস উপযুক্ত সময়। নচেৎ মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হলে জ্যৈষ্ঠ মাস উত্তম। প্রতিটি গর্তে তিনটি করে চারা ২০ সে. মি. দ রত্বে ত্রিভুজাকারে রোপণ করতে হবে। চারা বিকালে রোপণ করাই ভালো। রোপণের পরপরই সেচ দেয়া ভালো। এরপর যতদিন না চারা লেগে উঠে (Establish) ততদিন সেচ দেয়ার প্রতি যত্নবান হতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর সেচের প্রয়োজন হতে পারে।

## পরিচর্যা

ফুল আসার পর প্রতি গর্তে একটি স্ত্রীগাছ রেখে অন্যান্য গাছ তুলে ফেলতে হয়।

পেঁপে বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর সেচ দিতে হয়। মাটি মাঝে মাঝে হালকা কুপিয়ে দেয়া ভালো। রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকেই ফুল আসা শুরু করে। ফুল দেখে কোনটি স্ত্রী গাছ কোনটি পুরুষ গাছ চেনা যায়। সুতরাং এসময় প্রতি গর্তে একটি করে স্ত্রী গাছ রেখে আর সব গাছ সে স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক উপড়ে তুলে ফেলতে হবে। তবে প্রতি ২০টি গাছের জন্য একটি করে পুর€ষ গাছ রাখতে হয় যাতে পরাগায়ণে সুবিধা হয়। পরাগায়ণ ছাড়া সব স্ত্রী ফুল ঝরে পড়ে যাবে, ফল ধরবে না।

**ফলের যত্ন ঃ** পেঁপে গাছের প্রতি পর্বে (Node) ফল আসে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপর্বে একটির পরিবর্তে এক সাথে বেশ ক'টি ফল আসে এবং এগুলো যথাযথ বাড়তে পারে না। এসব ক্ষেত্রে ছোট অবস্থাতেই প্রতিপর্বে দু একটি ফল রেখে আর সব ফল ভেঙ্গে ফেলতে হয়।

**রোগ ঃ** Phytophthora Root Rot পেঁপে গাছের একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগে কান্ডের গোড়া পঁচে যায়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছ দু'একটি হলে যতশীঘ্র সম্ভব পেঁপে বাগান থেকে সরে ফেলা উচিত। পেঁপের ভাইরাস রোগ হতে পারে। তাছাড়া পেঁপে গাছে অন্য কোনো মারাত্মক রোগ বা পোকামাকড় নাই।

পাকা খাওয়ার জন্য যখনই পেঁপের গায়ে একটু হলুদ রং দেখা দেয় তখনই আহরণ করা উচিত।

**ফল আহরণ ঃ** ফল ধরার দু'মাস পরেই সবজি হিসেবে এগুলো বাজারজাতকরণের জন্য আহরণ করা যেতে পারে। পাকা খাওয়ার জন্য যখনই পেঁপের গায়ে একটু হলুদ রং দেখা দেয় তখনই আহরণ করা উচিত। গাছের সব পেঁপে একসাথে আহরণ করা যায় না। যখন যে ফলের রং হলুদ হবে তখনই সেটি আহরণ করতে হয়। এ অবস্থায় আহরণ করলে পেঁপে সম্পূর্ণ পাকতে ৫ থেকে ৭ দিন সময় নিয়ে থাকে। আহরণের সময় পেঁপে আঘাত না পায় সেদিকে যত্নবান হতে হবে। আহরণের পর ফলগুলো একসারিতে খড়ের ওপর রেখে খড় দিয়ে ঢেকে রাখলে সমানভাবে পাকে। ফল ধরার ৯০ থেকে ১০০ দিনের মধ্যে ফল আহরণের উপযুক্ত হয়ে থাকে।

যদিও ২-৩ বছর পর্যন্ত পেঁপে গাছ ভালোভাবেই ফল দিতে পারে কিন্তু গাছ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

যদিও ২-৩ বছর পর্যন্ত গাছ ভালোভাবেই ফল দিতে পারে কিন্তু গাছ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফল ছোট হয় এবং পেঁপে বাগানে নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য গাছে ৩০-৪০ টি ফল আসার পর আর ফল ধরতে না দেয়ায় ভালো। পরবর্তী ফুলগুলো ভেঙ্গে দেয়া যায়। তাহলে শেষ ফলটি ধরার ৬০ দিন পর যদি গাছ থেকে সব ফল আহরণ করা হয় তবে এগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ পাকা ফল হিসেবে বাজারজাত করা যেতে পারে। এভাবে ১৪-১৫ মাস পরেই পেঁপে বাগান ভেঙ্গে ফেলা যেতে পারে। পেঁপের ফলন গাছ প্রতি ১৫-২০ কেজি এবং হেক্টর প্রতি ৩০-৫০ টন হতে পারে।

***অনুশীলন (Activity) ঃ*** *স্ত্রী এবং পুরুষ গাছ কীভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা বর্ণনা করুন। প্রতি গর্তে কয়টি চারা কীভাবে রোপিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত কয়টি চারা ফল ধারণের জন্য রাখতে হবে তা আলোচনা করুন।*

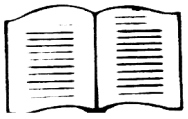

**সারমর্ম ঃ** পেঁপে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভালো জন্মে। গাছ সারা বছরই ফুল ও ফল দিয়ে থাকে। সামান্য সময়ের জন্য হলেও জলাবদ্ধতা গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। পুরুষ ও স্ত্রীফুল আলাদা গাছে থাকে। পেঁপে পরপরাগায়িত এবং বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার হয়ে থাকে বলে অসংখ্য প্রকারের পেঁপে দেখা যায়। বিশেষ কোনোজাত আবাদ ও সংরক্ষণ করতে হলে নিয়ন্ি ত পরাগায়ণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা উচিত। প্রতি গর্তে তিনটি পেঁপে চারা রোপণ করা হয়। তাহলে প্রতি গর্তে অন্তত একটি স্ত্রীগাছ পাওয়া যায়। বাগানের শতকরা ন্যূনতম ৫ ভাগ পুর€ষগাছ পরাগায়ণের সুবিধার্থে থাকা প্রয়োজন। সেচের ব্যবস্থা থাকলে আশ্বিন/মাঘ মাস চারা রোপণের উত্তম সময়। তাছাড়া মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হলে জ্যৈষ্ঠ মাস ভালো সময়। রোপণের ৪/৫ মাস পরে ফুল দেখে স্ত্রী বা পুরুষগাছ চেনা যায়। তখন গর্তে একটি স্ত্রী গাছ রেখে বাকীগুলো উপড়ে ফেলতে হয়। ফল ধরার দু'মাস পরেই সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। পাকা খাওয়ার জন্য গাছে পেঁপের গায়ে একটু হলুদ রং দেখা দিলেই আহরণ করা উচিত। পেঁপের ফলন গাছ প্রতি ১৫-২৫ কেজি এবং হেক্টর প্রতি ৩০-৫০ টন হতে পারে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

**১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।**

ক) পেঁপে একক সরস বেরী জাতীয় ফল।

খ) গোশত সিদ্ধ করতে পেপাইন কোনো কাজে লাগে না।

গ) পুরুষফুল লম্বা পুষ্পমঞ্জরী দন্ডে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। স্ত্রীফুল সাধারণত বোঁটাহীন হয়।

ঘ) বীজ পরিষ্কার করার পর ভালোভাবে শুকিয়ে নিছিদ্র আধারে (যাতে বাতাস ঢুকতে না পারে) সংরক্ষণ করলে অনেক বছর বীজ নষ্ট হয় না।

ঙ) ফল হিসেবে খাওয়ার জন্য পেঁপে গাছে ভালোভাবে পাকানো উচিত।

**২। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।**

ক) মাটির পিএইচ .....থেকে .....হলেই পেঁপের সফল চাষ বা চমৎকার বৃদ্ধি হতে পারে।

খ) গাছের কান্ড, পাতা, পাতার বোঁটা এবং ফল থেকে যে সাদা কষ বের হয় তাকে ..... বলে।

গ) পেঁপের ফুল সাধারণত .....ও .....।

ঘ) পেঁপের বীজের গায়ে যে পিচ্ছিল পদার্থ থাকে তা ..... রোধ করে।

ঙ) প্রতি গর্তে .....চারা রোপণের পরামর্শ দেওয়া হয়।

**৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

র) প্রতি হেক্টরে কতটি পেপের চারার প্রয়োজন?

- ক) ৫৫০০ টি
- খ) ৬৫০০ টি
- গ) ৭৫০০ টি
- ঘ) ৮৫০০ টি

রর) পেঁপের মারাত্তক রোগ কোন্‌টি?

- ক) ফাইটপথোরা রুট রট
- খ) মোজাইক
- গ) ব্রাইট
- ঘ) বালি টপ

# ব্যবহারিক

## পাঠ ৬.৪ আনারসের বিভিন্ন ধরনের চারার শনাক্তকরণ ও মাঠে রোপণ পদ্ধতি অনুশীলন

### এ পাঠ শেষে আপনি –

- আনারসের বিভিন্ন ধরনের চারা শনাক্তকরণে সক্ষম হবেন।
- আনারসের মাঠে কী কী পদ্ধতিতে চারা রোপণ করতে হয় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আনারসের হেক্টর প্রতি কী পরিমাণ চারা রোপণের প্রয়োজন হবে তা নির্ণয় করতে পারবেন।

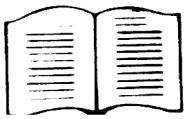

আনারসের বংশ বিস্তার অঙ্গজ পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে আনারসের বংশ রক্ষার জন্য চার শ্রেণির সাকার (Sucker) উৎপন্ন হয়। এগুলো হচ্ছে (১) ক্রাউন (Crown) (২) পিপ (Slips) (৩) সাকার (Sucker or Stem sucker or Shoot sucker) ও (৪) গ্রাউন্ড সাকার (Ground sucker) । তাছাড়া যে গাছ ফল দিয়েছে তার কান্ড (Stump) থেকেও চারা উৎপন্ন করে আনারসের বংশ বিস্তার করা যায়। (চিত্র-৬.১.২ দেখুন) এ চার প্রকারের চারা দেখান হলো। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

### ক্রাউন (মুকুট)

আনারস গাছের ফুল বের হওয়ার সাথে সাথে ফুলের মাথায় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পাতা সম্বলিত ক্রাউন বা মুকুট বের হয়।

আনারস গাছের ফুল বের হওয়ার সাথে সাথে ফুলের মাথায় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পাতা সম্বলিত ক্রাউন বের হয় (চিত্র-৬.১.২ দেখুন)। জায়ান্ট কিউ এবং হানিকুইন জাতের ফল বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রাউনও বৃদ্ধি পায়। ফল যখন পাকতে শুরু করে তখন ক্রাউনসহ ফল আহরণ করা হয়। ফলের সাথে ক্রাউন থাকলে ফল বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়।

### সাকার (Sucker or Stem sucker or Shoot sucker)

গাছে ফল আসার কিছু-দিন পরেই পত্রাক্ষ থেকে 'সাকার' বের হয়।

গাছে ফল আসার কিছুদিন পরেই পত্রাক্ষ থেকে 'সাকার' বের হয়। সাধারণত এগুলো সাকার বা কান্ডের চারা নামেই পরিচিত (চিত্র- ৬.১.২ দেখুন)। ফল আহরণের প্রায় দু'মাস পর ভাদ্র-আশ্বিন মাসে আনারস বাগানে যথেষ্ট রস থাকা অবস্থায় এ সাকারগুলো ভাঙ্গা হয়। সাকারগুলো ভাঙ্গার পর ছায়াতে রাখা হয়। তবে ভাঙ্গার দুসপ্তাহের মধ্যে রোপণ করা ভালো। যদিও যে কোনো ওজনের সাকার রোপণ করা যেতে পারে। কিন্তু ৪০০-৫০০ গ্রাম ওজনের সাকার রোপণের জন্য শ্রেয় মনে করা হয়।

### পিপ (Slips) বা বোঁটার চারা

ফলের নিচে বোঁটা থেকে পিপ বের হয়।

সাকার বা কান্ডের চারা বের হওয়ার পর এজাতীয় চারা অর্থাৎ পিপ ফলের নিচেই বোঁটা থেকে বের হয় (চিত্র-৬.১.২ দেখুন)। পিপ অনেকগুলো বের হয়। কোনো কোনো জাতের ৭-৮ টি পর্যন্ত বের হয়। এগুলো বিভিন্ন বয়স ও সাইজের হতে পারে অর্থাৎ একই সাথে অথবা বিভিন্ন সময়ে এগুলো বের হয়। অনেক বিজ্ঞানী পিপকে সবচেয়ে ভালো চারা বলে উল্লেখ করেছেন। ফলের সাথেই পিপগুলো কাটা পড়ে। যেগুলো ২০ থেকে ৩০ সে. মি. লম্বা এবং ৩৫০ থেকে ৪৫০ গ্রাম ওজনের সেগুলো সরাসরি জমিতে রোপণের উপযুক্ত। ছোটগুলো বড় করে রোপণের জন্য নার্সারিতে রোপণ করা হয়।

### গ্রাউন্ড সাকার (Ground Sucker) বা গোড়ার চারা

গ্রাউন্ড সাকার কান্ডের যে অংশ মাটির কাছাকাছি অথবা নিচে সে অংশ থেকে বের হয়।

এ জাতের সাকার সব গাছে আসে না। এ সাকারগুলো কান্ডের যে অংশ মাটির কাছাকাছি অথবা নিচে, সে অংশ থেকে বের হয় (চিত্র- ৬.১.২ দেখুন)। গ্রাউন্ড সাকারের শিকড় গজায় এবং তা মাটিতে প্রোথিত হয়ে পুষ্টি ও পানি সংগ্রহ করে। অন্যান্য জাতে প্রতি গাছে গ্রাউন্ড সাকার উৎপন্ন হয় না।

## জমিতে চারা রোপণ পদ্ধতি

আনারসের চারা এক বা দুই সারি পদ্ধতিতে রোপণ করা যেতে পারে।

আনারসের চারা এক সারি পদ্ধতি অথবা দুই সারি পদ্ধতিতে রোপণ করা যেতে পারে। এক সারি পদ্ধতিতে ২০-২৫ সে. মি. উঁচু করে ৫০ সে. মি. প্রশস্ত সুবিধা অনুযায়ী লম্বা মিড়ি তৈরি করুন। দুই মিড়ির মাঝখানে ৫০ সে. মি.। প্রশস্ত একটি নালা রাখুন। মিড়িতে চারা রোপণের আগেই মিড়ির মাটির সাথে ১০০০ গাছের জন্য ২০ কেজি গোবর, ১০ কেজি টিএসপি ও এক কেজি জিপসাম মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর মিড়ির মাঝখান দিয়ে রশি ধরে বা লাইন টেনে লাইনে ৪০ সে. মি. দূরে দূরে চারা রোপণের কাঁচি দিয়ে দাগ কেটে নিন। এরপর শাবল দিয়ে রোপণের জায়গা ৫ সে. মি. পরিমাণ গর্ত করে গর্তের মধ্যে চারা গোড়ার বসিয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে চারার চারপাশের মাটি শক্ত করুন। এক সারি পদ্ধতিতে ৪০ সে. মি. দূরত্বে চারা রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ২৫,০০০ চারার প্রয়োজন হয়।

দুই সারি পদ্ধতিতে আনারসের চারা রোপণ করা যেতে পারে। তবে দু'সারি পদ্ধতিতে চারা রোপণের সুপারিশ করা হয়। (চিত্র- ৬.১.৩ দেখুন) এ দু'সারি পদ্ধতিতে চারা রোপণ দেখান হলো। রোপণের পূর্বে দেয় সারের পরিমাণ একসারি ও দু'সারি পদ্ধতির জন্য একই। দু'সারি পদ্ধতিতে জমিতে রোপণের জন্য কত চারা প্রয়োজন তা নিম্নে বর্ণিত ফর্মুলা অনুযায়ী বের করা যায়।

## হেক্টর প্রতি চারা রোপণের সংখ্য নির্ণয়

$$\text{জমিতে রোপণের চারার সংখ্যা} = \frac{২ \times ক}{খ \times (গ + ঘ)}$$

এখানে ক = জমির পরিমাণ (বর্গমিটারে)
খ = এক মিড়ি থেকে পাশ্ববর্তীর মিড়ির দূরত্ব (মিটারে)
গ = গাছ থেকে গাছের দূরত্ব (মিটারে)
ঘ = সারি থেকে সারির দূরত্ব (মিটারে)

ধরি এক্ষেত্রে ঃ ক = ১০,০০০ বর্গমিটার অর্থাৎ এক হেক্টর
খ = ০.৫ মিটার
গ = ০.৪ মিটার
ঘ = ০.৫ মিটার

$$\text{অতএব এক হেক্টরে চারার প্রয়োজন (সংখ্যা)} = \frac{২ \times ১০,০০০}{০.৫ \times (০.৪ + ০.৫)} = ৪৪৪৪৪ \text{ টি}$$

## পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৬.৪

**১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।**

ক) আনারস গাছের ফুল বের হওয়ার সাথে সাথে ফুলের মাথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা সম্বলিত ক্রাউন বের হয়।

খ) গাছে ফল আসার বহুদিন পরেই পত্রাক্ষ থেকে সাকার বের হয়।

গ) যে পিপগুলো ২০-৩০ সে. মি. লম্বা এবং ৩৫০-৪৫০ গ্রাম ওজনের সেগুলো সরাসরি জমিতে রোপণ করতে হয় না।

ঘ) গোড়ার চারা কান্ডের যে অংশ মাটির কাছাকাছি অথচ নিচে, সে অংশ থেকে বের হয়।

ঙ) এক সারি পদ্ধতিতে চারা রোপণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

চ) সংগ্রহের পর ৫-১০ দিন পর চারার গোড়ার শুকনো ও মরা পাতা ফেলে দিতে হবে।

**২। শূণ্যস্থান পুরণ করুন।**

ক) গাছে ফল আসার কিছুদিন পরেই পত্রাক্ষ থেকে ..... বেড় হয়।

খ) কান্ডের যে অংশ মাটির কাছাকাছি বা নিচে যে অংশ থেকে ..... বের হয়।

গ) পিপ চারা ফলের নিচে ..... থেকে বের হয়।

ঘ) গ্রাউন্ড সাকারের ..... গজায় এবং তা মাটিতে প্রোথিত হয়।

ঙ) এক হেক্টরের চারার সংখ্যা ..... টি।

# ব্যবহারিক

## পাঠ ৬.৫ কলার বিভিন্ন ধরনের চারা শনাক্তকরণ ও মাঠে রোপণ পদ্ধতি অনুশীলন

**এ পাঠ শেষে আপনি –**

- কলার বিভিন্ন ধরনের চারা শনাক্তকরণে সক্ষম হবেন।
- কলার মাঠে চারা রোপণের সময়, রোপণ দূরত্ব ও রোপণ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

**চারা শনাক্তকরণ**

কলাগাছ সাধারণত সাকারের (Sucker) এর সাহায্যেই বংশ বিস্তার করে। সাকার দু'প্রকারের যেমন- (১) সোর্ড সাকার (Sword Sucker) ও (২) ওয়াটার সাকার (Water sucker)| সোর্ড সাকারের পোশাকীকান্ডের (Pseudostem) গোড়া বেশ মোটা ও মজবুত। এটি ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে ওপর দিকে বাড়তে থাকে। এর প্রথমে দু'টি এবং পরবর্তীতে আরও দু'টি মোট চারটি সরু পাতা সোজা উপরের দিকে বের হয়। সোর্ড সাকার সতেজ বাড়ন্ত গাছের কন্দের (Corm) নিচের অংশ থেকে জন্মে। অন্যদিকে যদি কন্দ আঘাতপ্রাপ্ত হয় অথবা নেমাটোড বা অন্য কোনো রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা কলা আহরণের পর বা অন্য কোনো কারণে (ঝড়ে বা অন্য কোনো কারণে গাছ ভেঙ্গে গেলে) গাছের পোষাকীকান্ড কেটে ফেলা হয় সেক্ষেত্রে ওয়াটার সাকার গুড়িকন্দের উপরিস্তরের চোখ থেকে বের হয়। এগুলোর পোশাকীকান্ড গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত একই সমান হয়ে থাকে অর্থাৎ সোর্ড সাকারের মত গোড়া মোটা এবং ক্রমান্বয়ে আগা সরু হয় না। পাতাগুলোর ক্ষুদ্রাকৃতির হলেও প্রশস্ত হয় এবং পাশে ঢালানো থাকে। এগুলোর কান্ড সোর্ড সাকারের কান্ডের চাইতে দুর্বল হয়। (চিত্র- ৬.৫.১ এবং চিত্র- ৬.৫.২ দেখুন)।

চিত্র ৬.৫.১ ঃ কলার সোর্ড সাকার

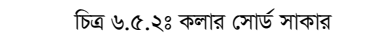

চিত্র ৬.৫.২ঃ কলার সোর্ড সাকার

## মাঠ রোপণ পদ্ধতি

সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর হলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কলার সাকার রোপণের উত্তম সময়।

**চারা রোপণের সময় ঃ** কলার সাকার বছরের যে কোনো সময় রোপণ করা যেতে পারে। তবে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে অতিরিক্ত বর্ষার জন্য জমি তৈরি এবং গর্ত করা ও ভরাট করা অসুবিধা। তাই এ দু'মাসে সাকার রোপণ না করাই ভালো। সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর হলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কলার সাকার রোপণের উত্তম সময়। সেচ সুবিধা থাকলে ভাদ্র-আশ্বিন এবং মাঘ-ফাল্গুনে রোপণের সুপারিশ করা হয়।

বাণিজ্যিক জাতসম হের সাকার ২ থ ২ মি. দূরত্বে বর্গাকারে রোপণের সুপারিশ করা হয়।

**রোপণের দ রত্ব ঃ** বাংলাদেশে যে ক'টি জাত চাষাবাদ হয় এগুলোর বৃদ্ধির যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন জাতের সাকার রোপণের দূরত্ব বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। যাহোক বর্তমানে বাণিজ্যিক জাতসম হের সাকার ২ থ ২ মি. দূরত্বে বর্গাকার পদ্ধতিতে রোপণের সুপারিশ করা হয়। ২ থ ২ মিটার দূরত্বে সাকার রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ২,৫০০ সাকার প্রয়োজন হয়।

**রোপণ পদ্ধতি ঃ** কলা চাষের জন্য কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি ও সমান করে নিতে হবে। তৈরি জমিতে জমির চারদিকে এক মিটার বা কিছু কম/বেশি বাদ দিয়ে বাকী জায়গায় দুই মিটার দূরে দূরে রশি দিয়ে সারি টেনে নিতে হবে। সারিতে দু'মিটার দূরে দূরে খুঁটি পুঁতে সাকার রোপণের স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। এই খুঁটিগুলোকে কেন্দ্র করে ৫০ থ ৫০ সে. মি. সাইজের ৫০ সে. মি. গভীর করে গর্ত খুঁড়তে হবে। খোঁড়ার সময় গর্তের উপরের ২৫ সে. মি. পর্যন্ত মাটি আলাদা করে রাখতে হবে। সাকার রোপণের ১০-১৫ দিন আগে গর্তের উপরের আলাদা করে রাখা মাটির সাথে ৫-৬ কেজি গোবর সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্তের উপরের ২০-২৫ সে. মি. মাটির সাথে কোদালের হালকা কোপ দিয়ে সম্পূর্ণ টিএসপি (২৫০ গ্রাম), জিপসাম (১১০ গ্রাম) এবং জিংক সালফেট (২৫ গ্রাম) মিশাতে হবে। এরপর সেচ দিয়ে গর্তের মাটি ভিজে রাখলে ভালো হয়। এভাবে গর্তে সার মেশানোর ১০-১৫ দিন পর সাকার নির্দিষ্ট স্থানে রোপণ করতে হবে।

সাকার কত উঁচু তা গুরুত্বপ র্ণ নয় বরং এর ওজনই বেশি

৩-৪ মাস বয়সের সোর্ড সাকার রোপণ করা ভালো। সাকার কত উঁচু তা গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং সাকারের ওজনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রোপণের সময় গুড়িকন্দের ওজন ১.০ থেকে ১.৫ কেজি হওয়াই উত্তম। রোপণের সময় সাকার এমনভাবে রোপণ করতে হবে যে গুড়িকন্দ ৩০ সে. মি. মাটির নিচে চাপা পড়ে।

## পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৬.৫

**১। নিচের বাক্যগুলো সম্পর্কে সত্য/মিথ্যা লিখুন।**

ক) সোর্ড সাকারের পোশাকীকান্ডের গোড়া বেশ মোটা ও মজবুত। এটি ক্রমান্বয়ে সর€ হয়ে উপড় দিকে বাড়তে থাকে।

খ) কলা গাছের সাকার তিন প্রকার।

গ) সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর হলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কলার সাকার রোপণের উত্তম সময়।

ঘ) বাণিজ্যিক জাতসমূহের সাকার ২ থ ২ মি. দ রত্বে বর্গাকার পদ্ধতিতে রোপণের সুপারিশ করা হয়।

ঙ) সাকার কত উঁচু তা গুরুত্বপ র্ণ নয় বরং এর ওজনই বেশি গুরুত্বপ র্ণ।

**২। শূন্যস্থান পুরণ করুন।**

ক) কলাগাছের সাকার দুই প্রকারের যেমন (১) ..... ও (২) .....

খ) ২×২ মিটার দূরত্বে সাকার রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ..... সাকার প্রয়োজন।

গ) ..... বয়সের সোর্ড সাকার রোপণ করা ভালো।

ঘ) গর্তে সার মেশানোর ..... দিন পর সাকার নির্দিষ্ট স্থানে রোপণ করতে হবে।

## পাঠ ৬.৬ স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন ধরনের ফলের জাত শনাক্তকরণ

**এ পাঠ শেষে আপনি –**

- আনারসের বিভিন্ন জাতসমূহ শনাক্তকরণে সক্ষম হবেন।
- কলার বিভিন্ন জাতসমূহ শনাক্তকরণে সক্ষম হবেন।
- পেঁপের একটি জাত শনাক্তকরণে সক্ষম হবেন।

### আনারস

আনারসের বাণিজ্যিক জাতসমূহ বাহ্যিক অঙ্গসংস্থানের (Morphology) ওপর ভিত্তি করে অর্থাৎ বাহ্যিক গঠন ও বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে - (১) কায়েন (Cayenee) (২) কুইন (Queen) ও (৩) রেড স্প্যানিশ (Red spanish)। বাংলাদেশে কায়েন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত জাতটি 'জায়ান্ট কিউ' নামে পরিচিত। কুইন শ্রেণির জাতটি হানিকুইন এবং রেড স্প্যানিশ শ্রেণির জাতটি ঘোড়াশাল নামে পরিচিত।

জায়ান্ট কিউ জাতের ফল অন্যান্য জাতের ফলের চাইতে অনেক বড় হয়।

**জায়ান্ট কিউ ঃ** জায়ান্ট কিউ জাতটি চিত্র- ৬.১.১ এ দেখানো হলো। ফল তুলনাম লক ভাবে অন্যান্য জাতের ফলের চাইতে অনেক বড় হয়। ফলের ওজন গড়ে প্রায় ২.৫ কেজি হয়। ফল প্রায়ই চোঙ্গাকৃতি তবে উপরের দিকটা ক্রমান্বয়ে সরু। কাঁচা অবস্থায় ফলের রং গাঢ় সমুজ হয়। যাহোক পাকা ফলগুলো হলুদাভ হয়। ফলের চোখগুলো বড় এবং ভাসা অবস্থায় থাকে। পাকা ফলের শাঁস সাদাটে।

হানিকুইন সবচেয়ে আগাম জাত।

**হানিকুইন জাত ঃ** হানিকুইন জাতের ফল ছোট সাইজের হয়। এর গড় ওজন প্রায় ১.২৫ কেজি। তবে এক থেকে দু' কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফল প্রায়ই চোঙ্গাকৃতির। এর চোখগুলো ছোট এবং কিছু গভীরে প্রোথিত। কাঁচা অবস্থায় ত্বকের রং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। পাকা অবস্থা সম্পূর্ণ ফল হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পাকা ফলের শাঁস সোনালী রং ধারণ করে। ফল খুবই মিষ্টি এবং সুঘ্রাণযুক্ত।

**ঘোড়াশাল জাত ঃ** ফলের গড় ওজন এক থেকে দুই কেজি হয়। কাঁচা অবস্থায় ফল লালচে দেখায়। পাকা ফলের রং গাঢ় লাল। শাঁস সাদাটে এবং আঁশযুক্ত। চোখ ছোট তবে গভীরে প্রোথিত। তাই এর ফল ছেলা খুব কঠিন। স্বাদে কিছুটা টক।

### কলার জাত

অমৃতসাগর, সবরি, চাম্পা ও কবরি- এ চারটি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কলার জাত।

**অমৃতসাগর কলা ঃ** এজাতের কাঁদির (Bunch) ওজন গড়ে প্রায় ১০-১২ কেজি হয়। গড়ে ৬-৭ টি ফানা (Hands) হয় এবং প্রতি ফানায় ১২-১৪ টি ফল হয়। একটি কাঁদিতে ৬০ থেকে ৭৫ টি ফল (Finger) হতে পারে। প্রতিটি কলার ওজন গড়ে প্রায় ৯০ গ্রাম হয়। পাকা কলার ত্বকের রং উজ্জল হলুদ এবং শাঁসের রং মাখনের (Cream colour) মত।

**সবরি কলা ঃ** এজাতের কাঁদির ওজন প্রায় ৮-১০ কেজি হয়। গড়ে ৫-৭ টি ফানা হয়। প্রতিটি ফানায় ১২-১৪ টি ফল হয় এবং প্রতি কাঁদিতে গড়ে ৬০-৭০ টি ফল হতে পারে। ফলের গড় ওজন প্রায় ৮৫ গ্রাম হয়। পাকা কলার ত্বকের রং সমান হলুদ এবং শাঁস মাখনের মত রং হয়।

**কবরি কলা ঃ** এর কাঁদির ওজন গড়ে ১২-১৪ কেজি হয়। গড়ে ৭-৮ টি ফানা থাকে এবং কাঁদি প্রতি ৯০-১০০ টি ফল থাকে। ফলের গড় ওজন ৮৫ গ্রাম হয়ে থাকে। পাকা অবস্থায় এর ত্বকের রং সবুজাভ হলুদ হয় এবং শাঁসের রং মাখনের মত হয়। এতে দু'একটি বীজ পাওয়া যায়। কবরি কলা স্বাদে একটু টক লাগে।

**চাম্পা কলা ঃ** চাম্পা কলা চিত্র- ৬.২.১ এ দেখানো হলো। এর কাঁদির ওজন গড়ে ১২-১৫ কেজি হয়। গড়ে ১০-১২ টি বা আরও বেশি ফানা থাকে। কাঁদি প্রতি ফলের সংখ্যা ১২০-১৪০ হতে পারে। ফলের গড় ওজন ৬০ গ্রাম হয়ে থাকে। পাকা কলার ত্বক সর্বত্র সমান উজ্জ্বল হলুদ হয় এবং শাঁসের রং মাখনের মত হয়। চাম্পা কলা স্বাদে টকটক লাগে।

শাহী জাতের পেঁপের পাকা ফলের শাঁসের রং গাঢ় কমলা রংয়ের।

**পেঁপের জাত ঃ** পেঁপে পরপরাগায়িত ফল। বাংলাদেশে সাধারণত পরপরাগায়িত বীজ দ্বারাই এর বংশ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বলতে গেলে এদেশে পেঁপের কোনো নিদিষ্ট জাত নাই। তবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯২ সালে শাহী নামে একটি পেঁপে জাত মুক্তায়িত করেছে। এই ফল খেতে সুস্বাদু। নিম্নে শাহী জাতের বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো।

গাছের উচ্চতা- ১৮০ সে. মি., পাতার সংখ্যা- ১৯, পাতার বোঁটার দৈর্ঘ্য- ২৫.৮৪ সে. মি., পাতার দৈর্ঘ্য- ২৫.৫০ সে. মি., পাতার প্রস্থ- ২৫.৩৯ সে. মি., প্রতি বোঁটায় ফুলের সংখ্যা- ৩, ফলের আকার- ডিম্বাকৃতি, ফলের ওজন- ৭০০-১০০০ গ্রাম, শাঁসের রং- গাঢ় কমলা, গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা- ৪৫-৬০ টি, ফলন- গাছ প্রতি ৩৫-৫০ কেজি।

## পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৬.৬

**১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।**

ক) হানিকুইন জাতের ফলের চোখগুলো ছোট এবং কিছু গভীরে প্রোথিত।

খ) কাঁচা অবস্থায় ঘোড়াশাল জাতের ফল সবুজাভ দেখায়। পাকা ফলের রং গাঢ় সবুজ।

গ) অমৃতসাগর জাতের কাঁদির ওজন প্রায় ১০-১২ কেজি হয়। পাকা কলার ত্বকের রং উজ্জ্বল হলুদ।

ঘ) সবরি জাতের কাঁদির ওজন প্রায় ৮-১০ কেজি হয়। পাকা কলার ত্বকের রং সমান হলুদ হয়।

ঙ) কবরী জাতের পাকা কলার ত্বকের রং সবুজাভ হলুদ হয় না। কলায় কখনও বীজ থাকে না। কবরী কলা স্বাদে খুবই মিষ্টি।

চ) চাম্পা জাতের পাকা কলার ত্বক সর্বত্র সমান উজ্জ্বল হলুদ হয়। চাম্পা কলা স্বাদে টকটক লাগে।

**২। শূন্যস্থান পুরণ করুন।**

ক) আনারসের জাতসমূহকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে (১)..... (২) ..... ও (৩) .....।

খ) কায়েন শ্রেণির জাতটি ..... রেড স্প্যানিশ শ্রেণির জাতটি ..... নামে পরিচিত।

গ) অমৃতসাগর জাতের কাঁদিতে গড়ে .....টি ফানা হয় এবং প্রতি ফানায় ..... টি ফল হয়।

ঘ) চাম্পা কলা স্বাদে ..... লাগে।

ঙ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯২ সালে ..... নামে একটি পেঁপের জাত মুক্তায়িত করেছে।

# ব্যবহারিক

## পাঠ ৬.৭ স্বল্পমেয়াদী ফলের আয়-ব্যয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুশীলন

**এ পাঠ শেষে আপনি –**

- আনারসের আয়-ব্যয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারবেন।
- পেঁপের আয়-ব্যয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারবেন।
- কলার আয়-ব্যয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারবেন।

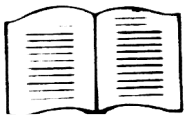

ফল উৎপাদনে খরচের হিসাব সংরক্ষণ করা এবং আয় লিপিবদ্ধ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লাভ-ক্ষতি অবশ্য নির্ভর করে উৎপাদন খরচ, ফলন ও ফসলের দামের ওপর। উৎপাদন খরচ দু'ধরণের হয়ে থাকে- স্থায়ী খরচ ও পরিবর্তনশীল খরচ। স্থায়ী খরচ বলতে জমির ম ল্যের ওপর সুদ, ভাড়া, কর ইত্যাদি বুঝায়। অন্যদিকে পরিবর্তনশীল খরচ বলতে শ্রমিক মজুরী এবং চাষাবাদের গরু, বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক প্রভৃতির মূল্য/ভাড়া বুঝায়। বিভিন্ন খরচের ওপর সুদও এর অন্তর্ভুক্ত। স্থায়ী খরচ ও পরিবর্তনশীল খরচ-এ এ দুটো মিলেই হচ্ছে মোট খরচ।

মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে প্রকৃত আয় পাওয়া যাবে।

মোট আয় থেকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বাদ দিলে মোটামুটি আয়ের (Gross return) হিসাব পাওয়া যায়। Gross return হচ্ছে মোট আয় (আনারস ও চারা বিক্রয়লব্ধ টাকা)। তবে মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে প্রকৃত আয় পাওয়া (Net return) যাবে। এদেশে আনারস, পেঁপে ও কলা উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসেবের নমুনা নিচে দেয়া হলো।

**সারণি ১ ঃ প্রতি হেক্টর জমিতে আনারসের আয়-ব্যয়ের হিসাব**

| খরচের খাত | পরিমাণ | ম ল্য (টাকা) | মন্ ব্য |
|---|---|---|---|
| **শ্রম-দিবস (প্রতিদিন ৮ ঘন্টা হিসেবে)** | | | |
| পারিবারিক শ্রম | ৬০ দিন | ৩০০০.০০ | প্রতিদিন ৫০/- |
| চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক | ৫০ দিন | ২৫০০.০০ | ” |
| মোট | ১১০ দিন | ৫৫০০.০০ | ” |
| **সাকার** | | | |
| নিজস্ব | ২০,০০০ | ২০,০০০.০০ | প্রতি সাকার ১/- |
| অন্যের থেকে ক্রয় করা | ২০,০০০ | ২০,০০০.০০ | ” |
| মোট | ৪০,০০০ | ৪০,০০০.০০ | ” |
| **গোবর সার** | | | |
| নিজস্ব | ৫০০০.০০ কেজি | ১২৫০.০০ | প্রতি কেজি ০.২৫/- |
| ক্রয়কৃত | ৫০০০.০০ কেজি | ১২৫০.০০ | ” |
| মোট | ১০,০০০.০০ কেজি | ২৫০০.০০ | ” |
| **রাসায়নিক সার** | | | |
| টিএসপি | ৪০০ কেজি | ২৮০০.০০ | প্রতি কেজি ৭/- |
| ইউরিয়া | ৬০০ কেজি | ৩৬০০.০০ | প্রতি কেজি ৬/- |
| এমপি | ৬০০ কেজি | ৩৬০০.০০ | ” |
| জমির ওপর ১২% | - | ২৪০০০.০০ | প্রতি হেক্টর এক লক্ষ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| দু'বছরের সুদ | | | টাকা |
| নগদ টাকার ওপর দু'বছরের জন্য ১২% হারে সুদ | - | ৮১০০.০০ | |
| **মোট পরিবর্তনশীল খরচ** | | | |
| নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে | - | ৬৫৮৫০.০০ | |
| মোট খরচের ভিত্তিতে | - | ৯০১০০.০০ | |
| **মোট আয়** | | | |
| আনারস ফল (দুই বছরে ৮০% গাছের ফল হিসেবে) | ৩২০০০ টি ফল | ১৬০,০০০.০০ | প্রতি আনারসের ম ল্য ৫/- |
| সাকার বিক্রি | ৪০,০০০ টি | ৪০,০০০.০০ | প্রতি সাকার ১/- |
| মোট | - | ২০০,০০০.০০ | |
| **নীট মুনাফা** | | | |
| নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে | - | ১৩৪,১৫০.০০ | |
| মোট খরচের ভিত্তিতে | - | ১০৯,৯০০.০০ | |
| **আয়-ব্যয়ের অনুপাত** | | | |
| নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে | - | ৩.০৩ | |
| মোট খরচের ভিত্তিতে | - | ২.২২ | |

**সারণি ২ ঃ প্রতি হেক্টর জমিতে পেঁপে উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব (দু'বছরের ভিত্তিতে)**

| খরচের খাত | পরিমাণ | মূল্য (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| **জমি তৈরি ও গর্ত খনন** | | | |
| টিলারের সাহায্যে চাষ | তিনবার | ৭৫০/- | প্রতি চাষ ২৫০/- |
| মাপ দিয়ে চারা রোপণের নির্দিষ্ট | পারিবারিক শ্রম-১ | ৫০/- | শ্রম মজুরী ৫০/- |
| স্থান চিহ্নিতকরণ | চুক্তিবদ্ধ শ্রম-৪ | ২০০/- | |
| গর্ত খনন ২৫০০ টি | পারিবারিক শ্রম- | ১২৫০/- | |
| | ২৫ চুক্তিবদ্ধ শ্রম- | ৩৭৫০/- | |
| | ৭৫ | | |
| **সারের ম ল্য ও প্রয়োগ** | | | |
| গোবর বা কম্পোস্ট সার গাছ প্রতি ১০ কেজি হিসেবে (মোট ২৫ টন) | পারিবারিক -১০ টন | ১০০০/- | প্রতি টন ১০০/- |
| | | ১৫০০/- | |
| | কেনা- ১৫ টন | | |
| ইউরিয়া (গাছপ্রতি দুছরে ৮ কিস্তিতে ১৪০০ গ্রাম | ৩৫০০ কেজি | ২১০০০/- | প্রতি কেজি ৬/- |
| টিএসপি (গাছ প্রতি ২৫০ গ্রাম) | ৬২৫ কেজি | ৪৩৭৫/- | প্রতি কেজি ৭/- |
| এমপি (দু'বছরে ৮ কিস্তিতে গাছ প্রতি ৮০০ গ্রাম) | ২০০০ কেজি | ১২০০০/- | প্রতি কেজি ৬/- |
| সার সার প্রয়োগ ৮ কিস্তিতে | পারিবারিক শ্রম- | ৬০০/- | |
| | ১২ চুক্তিবদ্ধ শ্রম- | ১৯০০/- | |
| | ৩৮ | | |
| **পরিচর্যা** | | | |
| আগাছা দমন ইত্যাদি কারণে দু'বছরে টিলারের চাষ | চার বার | ১০০০/- | |
| গাছের গোড়া পরিষ্কার ও সার প্রয়োগ (৮ বার) | পারিবারিক শ্রম- | ১২৫০/- | |
| | ২৫ চুক্তিবদ্ধ শ্রম | ৩৭৫০/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ৭৫ | | |
| সেচ নালা তৈরি | চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২৫ | ১২৫০/- | |
| সেচ দুই খরা মৌসুমে | আট বার | ২০০০/- | |
| গাছের খুঁটির মূল্য | ২৫০০ টি | ২৫০০০/- | প্রতি খুঁটি ১০/- |
| খুঁটির সাহায্যে গাছে ঠেকনা দেয়া | চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২৫ | ১২৫০/- | |
| **সুদ** | | | |
| নগদ টাকার ওপর ১২% দু'বছরের সুদ | - | ৯৯৬/- | |
| জমির মূল্যের ওপর ১২% হারে দু'বছরের সুদ | - | ২৪০০০/- | প্রতি হেক্টরের দাম এক লক্ষ টাকা হিসেবে |
| **মোট পরিবর্তনশীল খরচ** | | | |
| নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে | | ৭৯৭২৫/- | |
| মোট খরচের ভিত্তিতে | | ১০৮৮৭১/- | |
| **মোট আয় (দুই বছরে)** | | | |
| ২২৫০ টি গাছের (১০% পুরুষগাছ বাদ দিয়ে পাকা ফল | ৪৫০০০ কেজি | ৪৫০০০০/- | ১০/- কেজি |
| কাঁচা ফল | ২২৫০০ কেজি | ৬৭৫০০/- | ৩/- কেজি |
| মোট | ৬৭৫০০ কেজি | ৫১৭৫০০/- | |
| **নীট মুনাফা** | | | |
| নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে | | ৪৩৭৭৭৫/- | |
| মোট খরচের ভিত্তিতে | | ৪০৮৬২৯/- | |
| **আয়-ব্যয়ের অনুপাত** | | | |
| নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে | | ৬.৪৯ | |
| মোট খরচের ভিত্তিতে | | ৪.৭৫ | |

**সারণি ৩ ঃ প্রতি হেক্টর জমিতে কলা উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব (দেড় বছরের ভিত্তিতে)**

| খরচের খাত | পরিমাণ | মূল্য (টাকা) | মন্ ব্য |
|---|---|---|---|
| **জমি তৈরী ও গর্ত খনন** | | | |
| টিলারের সাহায্যে চাষ | তিনবার | ৭৫০/- | প্রতি চাষ ২৫০/- |
| মাপ দিয়ে চারা রোপণের | পারিবারিক শ্রম-১ | ৫০/- | শ্রম মজুরী ৫০/- |
| নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিতকরণ | চুক্তিবদ্ধ শ্রম-৪ | ২০০/- | |
| গর্ত খনন ২৫০০ টি | পারিবারিক শ্রম-২৫ | ১২৫০/- | |
| | চুক্তিবদ্ধ শ্রম-৭৫ | ৩৭৫০/- | |
| **সারের মূল্য ও প্রয়োগ** | | | |
| গোবর বা কম্পোষ্ট সার গাছ | পারিবারিক -১০ টন | ১০০০/- | প্রতি টন ১০০/- |
| প্রতি ১০ কেজি হিসেবে | কেনা- ১৫ টন | ১৫০০/- | |
| ইউরিয়া (৫ কিস্তিতে গাছ প্রতি ৯৫০ গ্রাম হিসেবে) | ২৩৭৫ কেজি | ১৪২৫০/- | প্রতি কেজি ৬/- |
| টিএসপি (গাছ প্রতি ২৫০ গ্রাম হিসেবে) | ৬২৫ কেজি | ৪৩৭৫/- | প্রতি কেজি ৭/- |
| এমপি (৫ কিস্তিতে গাছ প্রতি ৯৫০ গ্রাম হিসেবে) | ২৩৭৫ কেজি | ১৪২৫০/- | প্রতি কেজি ৬/- |
| সার সার প্রয়োগ ৫ কিস্তিতে | পারিবারিক শ্রম-১০ | ৫০০/- | |
| | চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২০ | ১০০০/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সাকার | ২৫০০ টি | ২৫০০/- | প্রতি সাকার ১/- |
| রোপণ | পারিবারিক শ্রম-২০ | ১০০০/- | |
| | চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২০ | ১০০০/- | |
| **পরিচর্যা** | | | |
| আগাছা দমন | টিলার চাষ ২ বার | ৫০০/- | |
| গাছের গোড়া পরিস্কার ও | পারিবারিক শ্রম-২০ | ১০০০/- | |
| সার প্রয়োগ (৫ বার) | চুক্তিবদ্ধ শ্রম-৪০ | ২০০০/- | |
| সেচ নালা তৈরী | চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২০ | ১০০০/- | |
| সেচ | ৪ বার | ১০০০/- | |
| গাছে ঠেকনা দেয়া খুঁটি | ২৫০০ টি | ২৫০০০/- | প্রতি খুঁটি ১০/- |
| গাছে ঠেকনা দেয়া | চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২৫ | ১২৫০/- | |
| ১৫ দিন পর সাকার ছাঁটাই | পারিবারিক শ্রম-২৫ | ১২৫০/- | |
| | চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২৫ | ১২৫০/- | |
| **সুদ** | | | |
| নগদ টাকা খরচের ওপর | ৭৫৫৭৫/- | ১৩৬০৪/- | ১২% |
| জমির মূল্যের ওপর | ১০০০০০/- | ১৮০০০/- | ১২% |
| **মোট পরিবর্তনশীল খরচ** | | | |
| নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে | | ৭৫৫৭৫/- | |
| মোট খরচের ভিত্তিতে | | ৮১৬২৫/- | |
| **আয়** | | | |
| কাঁদি | ২৫০০ টি | ২৫০০০০/- | কাঁদি প্রতি ১০০/- |
| সাকার | ৫০০০ টি | ৫০০০/- | সাকার প্রতি ১/- |
| মোট আয় | | ২৫৫০০০/- | |
| **নীট মুনাফা** | | | |
| নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে | | ১৭৯৪২৫/- | |
| মোট খরচের ভিত্তিতে | | ১৭৩৩৭৫/- | |
| **আয়-ব্যয়ের অনুপাত** | | | |
| নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে | | ৩.৩৭ | |
| মোট খরচের ভিত্তিতে | | ৩.১২ | |

## পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৬.৭

**১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।**

ক) লাভ-ক্ষতি নির্ভর করে উৎপাদন খরচ, ফলন ও ফসলের দামের ওপর।

খ) পরিবর্তনশীল খরচ বলতে শ্রমিক মজুরী এবং চাষাবাদের গরু, বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক প্রভৃতির মূল্য/ভাড়া বুঝায় না।

গ) প্রতি হেক্টর জমিতে পেঁপে উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের অনুপাত মোট খরচের ভিত্তিতে ১০.০০।

ঘ) প্রতি হেক্টর জমির মূল্য এক লক্ষ টাকা ধরে ১২% সুদে বছরে মোট সুদ হয় ২০,০০০ টাকা।

**২। শূন্যস্থান পুরণ করুন।**

ক) উৎপাদন খরচ দু'ধরনের হয়ে থাকে- ..... খরচ ও ..... খরচ।

খ) ..... বলতে জমির মূল্যের ওপর সুদ, ভাড়া, কর ইত্যাদি বুঝায়।

গ) মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে ..... পাওয়া যায়।

ঘ) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের দিনমজুরী ধরা হয়েছে ..... টাকা।

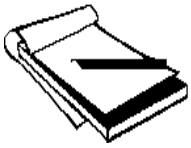

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৬

### সংক্ষিপ্ত ও রচনাম লক প্রশ্নাবলী

১। আনারসের উৎপত্তিস্থল ও এর জাতসমূহের বর্ণনা লিখুন।

২। আনারসের বংশ বিস্তারকারী চারাগুলোর বৈশিষ্ট্য সহ নাম লিখুন।

৩। একসারি পদ্ধতিতে কিভাবে আনারস চাষ করবে তা বর্ণনা করুন।

৪। কলার পুষ্টিমান, ব্যবহার এবং জাতসমূহের বর্ণনা দিন।

৫। কলার চারা রোপণ পদ্ধতি লিখুন।

৬। কলার চারা শনাক্তকরণের পদ্ধতি লিখুন।

৭। পেপের চাষ প্রণালি বর্ণনা করুন।

৮। আনারস, কলা ও পেঁপের জন্য জলবায়  বর্ণনা করুন।

৯। আনারস, কলা ও পেঁপের ফল আহরণ পদ্ধতি ও ফলণ লিখুন।

১০। আপনার বাড়ীর এক হেক্টর জমিতে কলা উৎপাদণের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরূপণ করুন।

## উত্তরমালা – ইউনিট ৬

### পাঠ ৬.১

১। ক) সত্য  খ) মিথ্যা  গ) সত্য  ঘ) সত্য  ঙ) মিথ্যা

২। ক) মাটিতে  খ) সরোসিস  গ) পিপ  ঘ) বন্ধাত্বের  ঙ) ৪০-৫০

৩। র) খ  রর) গ

### পাঠ ৬.২

১। ক) সত্য  খ) সত্য  গ) মিথ্যা  ঘ) মিথ্যা  ঙ) মিথ্যা

২। ক) উগান্ডা, তাঞ্জানিয়ার  খ) ৩৮.৮  গ) স্পেডিক্স  ঘ) ওয়াটার সাকার
ঙ) ১০০, ১৩০

৩। i) গ  ii) ঘ  iii) গ

### পাঠ ৬.৩

১। ক) সত্য  খ) মিথ্যা  গ) সত্য  ঘ) সত্য  ঙ) মিথ্যা

২। ক) ৬.০, ৬.৫  খ) লেটেক্স (Latex)  গ) একলিঙ্গী, ভিন্নবাসী  ঘ) অঙ্কুরোদগম
ঙ) তিনটি

৩। i) গ  ii) ক

## ব্যবহারিক

### পাঠ ৬.৪

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) মিথ্যা ঘ) সত্য ঙ) মিথ্যা
চ) সত্য

২। ক) সাকার খ) গ্রাউন্ড সাকার গ) বোটা ঘ) শিকড় ঙ) ৪৪৪৪৪

### পাঠ ৬.৫

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) সত্য ঘ) সত্য ঙ) সত্য

২। ক) সোর্ড সাকার, ওয়াটার সাকার খ) ২,৫০০ গ) ৩ - ৪ মাস ঘ) ১০ - ১৫

### পাঠ ৬.৬

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) সত্য ঘ) সত্য ঙ) মিথ্যা
চ) সত্য

২। ক) (১) কায়েন(২) কুইন (৩) রেড স্প্যানিশ
খ) জায়ান্ট কিউ, ঘোড়াশাল গ) ৬ - ৭, ১২ - ১৪ ঘ) টক টক ঙ) শাহী

### পাঠ ৬.৭

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) মিথ্যা ঘ) মিথ্যা

২। ক) স্থায়ী, পরিবর্তনশীল খ) স্থায়ী খরচ গ) প্রকৃত আয় ঘ) ৫০